GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

Class No. 182Qb.
Book No. 916.18.
N. L. 38.
MGIPC—S8—37 LNL/55—14-3-56—30,000.

RARE BOOK

NATIONAL LIBRARY
No. Imp. 3948
DATE 31/8/09
CALCUTTA

আয়ুর্ব্বেদ

৮ম বর্ষ } আশ্বিন ১৩৩০ সাল। { ১ম সংখ্যা।

বর্ষ-প্রশস্তিঃ।

[কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কাব্যতীর্থ-কবিভূষণ]

(১)

গীর্ব্বাণা স্থরমানবোত্তমচয়ৈর্ভক্তিপ্রস্থনস্রজা-
যস্যানেকবিপত্তিজাল হরণৌপাদৌ সদাবন্দিতৌ।
সর্ব্বেষ্টার্থকরং পরেশমনঘং পূর্ণং বিভূত্যা হি তম্
সর্ব্বাপৎপ্রশমার্থ মিষ্টমধমাবন্দামহেশঙ্করং ॥

১। স্থরাস্থর নরশ্রেষ্ঠ মহানুভবগণ সর্ব্বদা সকল বিপত্তি জাল নাশক যাঁহার চরণ যুগল বন্দনা করেন, সকলের সকল অভিষ্টার্থের পূরণকর্ত্তা সর্বৈশ্বর্য্য সম্পন্ন অভিষ্টদেব সেই দেবাধিপতি মঙ্গলময় পরমেশ্বর মহাদেবকে মতিহীন আমরা প্রণাম করি।

(২)

যা চিন্ময়ী জগদিদং নিখিলং স্বশক্ত্যা
ব্যাপ্যাবতিপ্রণয়তো জননী বিপদ্ভ্যঃ।
সাভক্তহৃৎসরসিজাসনবাসিনী নো
দুর্গাস্তু দুর্গতিহরা স্থচির প্রসন্না ॥

(114)

২। নিত্যানন্দময়ী, জগজ্জননী যিনি সমগ্র বিশ্বমণ্ডলকে নিজ শক্তি প্রভাবে ব্যাপ্ত করিয়া সর্ব্ববিধ বিপদ্ জাল হইতে প্রণয়ের সহিত রক্ষা করিতেছেন; ভক্তহৃৎপদ্মবাসিনী সেই স্থরেশ্বরী দুর্গাদেবী, প্রসন্না হইয়া, চিরদিন আমাদের দুর্গতি বিনাশ করুন,

IMPERIAL LIBRARY

(৩)

নমামঃ শঙ্করং সাক্ষাৎ
কাশীনাথং জগদ্‌গুরুং।
ধন্বন্তরিং মহাভাগং
অষ্টাঙ্গ বৈদ্যকাকরং॥

৩। সাক্ষাৎ শঙ্করাবতার, জগদ্‌গুরু কাশীনাথ মহাভাগ ধন্বন্তরি দেবকে প্রণাম করি। যিনি অষ্টাঙ্গ বৈদ্যক শাস্ত্ররূপ অমূল্য রত্নের আকররূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

(৪)

ভরদ্বাজং মহাদ্বারং
আয়ুর্ব্বেদাব্ধি সন্তরে।
সিদ্ধবাচং মহর্ষীশং
বন্দামহে চিরং নতাঃ॥

৪। বিশাল আয়ুর্ব্বেদ সাগর পারের প্রধান অবলম্বন বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ মহর্ষিপতি, ভরদ্বাজ দেবকে আমরা চিরনত হইয়া বন্দনা করি।

(৫)

সংসারকল্যাণপরাঃ পরেশ-
কৃপাশ্রিতা রক্ষিতবৈদ্যশাস্ত্রাঃ।
যে গ্রাহকা বৃত্তিহিতোপদেশ-
কৃপার্পণৈর্নো জনয়ন্তি সার্থান্॥

(৬)

বিদন্তু তে বিজ্ঞতমাঃ স্বভাব—
সিদ্ধাং চিরস্থাং হি কৃতজ্ঞতাং নঃ।
অষ্টাষ্টমাব্দে খলুপত্রিকেয়ং
প্রবর্ত্ততে যৎ মহিমা সতেষাং॥

(যুগ্মকম্)

৫।৬। সংসারের কল্যাণকার্য্য তৎপর, পরমেশ্বরের কৃপাপাত্র, বৈদ্যকশাস্ত্রের রক্ষক, যে গ্রাহকগণ, অর্থ, হিতোপদেশ ও সহানুভূতি প্রদান করিয়া আমাদিগকে সফলকাম করিতেছেন, সেই বিজ্ঞতম মহাত্মগণ সমীপে, আমাদের আন্তরিক চিরস্থায়ি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি, আজ এই আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা যে অষ্টম বর্ষে প্রবৃত্ত হইল—ইহা তাঁহাদেরই মহত্ত্বের পরিচায়ক।

বায়ুপিত্ত, কফ।

(কবিরাজ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত ব্যাকরণতীর্থ)

বায়ুর স্বাভাবিক ক্রিয়া।

"প্রকৃতির জ্ঞান না হইলে বিকৃতির জ্ঞান হইতে পারে না"——ইহাই হইল আমাদের প্রাচীন কথা, তাই বায়ুর স্বাভাবিক শারীর ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মহর্ষি চরক বায়ুর অবিকৃত ক্রিয়া সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"উৎসাহোচ্ছ্বাস নিঃশ্বাস চেষ্টা ধাতু গতিঃ সমা। সমোমোক্ষো গতিমতাং বায়োঃ কর্ম্মাবিকারজম্॥"

কার্য্যানুরাগকে উৎসাহ বলে ; যদিও ইহা মানস ব্যাপার,তথাপি উহা বায়ুরই স্বাভাবিক কর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রকারগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে, বায়ু রজোগুণ বহুল, সেই রজোগুণই সমস্ত কার্য্যের প্রবর্ত্তক, অতএব রজোগুণাধিক বায়ু সমস্ত শরীরও মানসব্যাপারের চালক,সুতরাং উৎসাহ মানস কার্য্য হইলেও তৎপ্রবর্ত্তকতা হেতুক বায়ুর কার্য্য বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উচ্ছ্বাস, শ্বাসগ্রহণ এবং নিশ্বাস অন্তর্গৃহীত বায়ুর ত্যাগ, ইহাকেই আমরা শ্বাস প্রশ্বাস বলি. এই শ্বাস প্রশ্বাসই আমাদের জীবনের সাক্ষী, যখন জীব-নিদ্রার শান্তক্রোড়ে শায়িত থাকে, তখন বহিরিন্দ্রিয় গ্রাম নিষ্ক্রিয়বৎ অবস্থান করে, তদানীং কেবল শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারাই চৈতন্য শক্তির উপলব্ধি করিতে পারি। চেষ্টা শব্দে সঙ্কোচ প্রসারণ-গমনাগমন প্রভৃতি দৈহিক ক্রিয়া বুঝায়, যদ্যপি ইহাকে কেহ কেহ স্নায়ুর কার্য্য বলিয়া থাকেন, তথাপি সেই স্নায়ু প্রতান বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়াই উক্ত ক্রিয়া নিষ্পাদন করে। "গতিমতাং সমোমোক্ষঃ" গতিমৎশব্দে অভ্যন্তরবর্ত্তী মল-মূত্র-স্বেদ-স্ত্রীরজঃ এবং বহির্মুখী রসাদি ধাতুগত মল ও উপধাতু সমূহ লক্ষিত হইয়াছে, সেই মলসমূহ বায়ুর ক্রিয়া ভিন্ন যথাযথ বহির্গত হইতে পারে না, কারণ জড় পদার্থ কখনও স্বয়ং ক্রিয়াশীল হইতে পারে না.——ইহাই হইল অবিকারজ বায়ুর কর্ম্ম। এই বায়ুর ক্রিয়া-কলাপ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বহির্জগত যেমন বায়ুর ক্রিয়ার অধীন, তেমনি আমাদের দেহজগৎও বায়ুকর্ম্মের অধীন, বোধ হয় এই জন্যই প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলী সমস্বরে বায়ুর সর্ব্বাত্মতা, জগদুৎপত্তি-স্থিতি-সংহার কারণ প্রভৃতি শক্তিমত্তা ঘোষণা করিয়াছেন।

বায়ুস্থান।

এই বিশ্ব জগতে বায়ু ভিন্ন যেমন স্থান নাই, আমাদের শরীর জগতেও তেমনি বায়ু ভিন্ন স্থান নাই, সুতরাং বায়ু আমাদের সর্ব্ব দেহব্যাপী, তথাপি উহাকে শাস্ত্রে কর্ম্ম-ভেদে স্থান ও নাম ভেদ করিয়াছে। আমরা

ক্রমশঃ তাহারই বর্ণনা করিব, সুশ্রুত বায়ুর স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা বস্তি (মূত্রাশয়). মলাশয়, কটি, সকৃথি, পাদদ্বয়, অস্থি। কিন্তু এই সমস্ত বাতস্থান হইলেও পক্কাশয়ই বায়ুর প্রধান স্থান, মলাশয় ও পক্কাশয় শব্দ তুল্যার্থ বাচী, গ্রহণীনাড়ীর অধোদেশবর্ত্তী ক্ষুদ্রান্ত্র ও স্থূলান্ত্র উভয়ই মলাশয় বা পক্কাশয় শব্দের প্রতিপাদ্য। কারণ ঐ সমস্ত স্থানেই পরিপাক প্রাপ্ত ভুক্তদ্রব্য মলীভূত হইয়া বহির্গমনের জন্য অবস্থান করে।

বায়ুর নাম।

এক ব্যক্তির কার্য্যভেদে যেমন পাচক, গায়ক, বাদক প্রভৃতি সংজ্ঞা হইয়া থাকে, তথা এক বায়ু ও শারীর কার্য্য ভেদে প্রাণ- উদান, সমান, অপান, ব্যান, এই পাঁচ নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই পঞ্চনামাত্মক বায়ু যখন হৃদয়ে থাকে তখন "প্রাণ" কণ্ঠদেশে "উদান" নাভিদেশে সমান, মলদ্বারে অপান ও সর্ব্ব শরীরগামীকে ব্যান" বায়ু বলিয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বায়ু সর্ব্বদেহ ব্যাপী, তথাপি উক্ত বস্তি প্রভৃতি স্থান প্রধান, কিন্তু তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান পক্কাশয়। কারণ ঐ স্থানেই ভুক্তদ্রব্যের কটু পাক বশতঃ বায়ুর উৎপত্তি হয় এবং ঐ উৎপন্ন বায়ুই শরীরস্থ অন্যান্য বায়ুর বল দান করে। দ্বিতীয়তঃ অন্নই দেহের বল, সেই অন্ন পরিপাচক অগ্নির বল পুনঃ বায়ু, অতএব পক্কাশয়স্থিত বায়ুই দেহ ধারণের অধিক উপকার করায় পক্কাশয়কে বায়ুর প্রধানতম স্থান কথিত হইয়াছে।

প্রাণবায়ু।

এখন আমরা কার্য্য ও স্থান ভেদে পঞ্চ বায়ুর ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। যে বায়ু বক্ত্র সঞ্চারী অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসরূপে নাসিকা ও মুখ দ্বারা গমনাগমন করে, তাহাকে "প্রাণ" বায়ু বলে, এবং এই প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক ভুক্তদ্রব্য নিক্ষিপ্ত হইয়া পাকস্থলীতে গমন করে। তথাচ সুশ্রুত,—'বায়ুর্যো বক্ত্র সঞ্চারী স প্রাণো নাম দেহ ধৃক,সোহন্নং প্রবেশয়ত্যন্তঃ প্রাণাংশ্চাবপ্য বলয়তে॥" এখন আমরা বক্ত্র সঞ্চারী প্রাণ বায়ু দেহধৃক্; এবং ভুক্তদ্রব্যের অন্তঃ প্রবেশক প্রাণবায়ু প্রাণাবলম্বক—এই দুই কথার ভিতরে কোন বিশিষ্টতত্ত্বনিহিত আছে কি না—তাহারই আলোচনা করিব, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই—বাহ্যবায়ুর ভিতরে অক্সিজন নামক এক প্রকার পদার্থ সমন্বিত বাহ্য বায়ু ফুস্‌ফুস্ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ফুসফস স্থিত দৈহিক রক্ত প্রবাহকে পরিষ্কৃত করে; সেই বিশুদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে গিয়া সর্ব্ব শরীরে প্রবাহিত হয়।

কিন্তু আমাদের আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ তাদৃশ রক্ত বিশোধন উপায় কোথাও বর্ণনা করেন নাই; অথচ ধমনী প্রবাহিত রক্তেরও শিরা প্রবাহিত রক্তের বর্ণাদির অনেক প্রভেদ দেখিতে পাই, "তপনীয়েন্দ্রগোপাভং পদ্মা- লক্তকসন্নিভং"—ইত্যাদি বিশুদ্ধ রক্তের যে লক্ষণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সেই লক্ষণাক্রান্ত রক্ত সুস্থ দেহে ধমনীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, আবার তদানীং শিরাস্থিত রক্ত মোক্ষণ করিলে তাহার বিপরীত লক্ষণযুক্ত রক্ত

দেখিতে পাই, সুতরাং ধমনীস্থ রক্ত বিশুদ্ধ এবং শিরাস্থিত রক্ত অবিশুদ্ধ এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। যদি কেহ শিরাস্থিত রক্তকে বাতাদি দোষ দূষিত রক্ত বলিতে চাহেন, তাহা হইলে জীবগণ সর্ব্বদাই রুগ্ন—এ আপত্তি আসিতে পারে, এবং স্বাস্থ্য শব্দের অভিধান উঠাইয়া দিতে হয়, মহর্ষিগণ যখন বিশুদ্ধ রক্তের লক্ষণ বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন, তখন তাঁহারা বিশোধন উপায় যে জানিতেন না—একথা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীকার করিতে পারে না। তবে সেই বিশোধন উপায় কি, তাহা হইল এখন চিন্তনীয়। আমরা পাশ্চাত্যমতের রক্ত শোধন প্রণালীর কথা বলিয়াছি, এবং তাহাতে বুঝিয়াছি যে, শ্বাস প্রশ্বাসই রক্ত শোধনের বিহিত উপায়, আয়ুর্ব্বেদ মতেও বক্ষসঞ্চারী প্রাণ বায়ু দেহ ধৃক্ অর্থাৎ দেহকে ধারণ বা রক্ষা করে, এই দেহ রক্ষাই রক্ত বিশোধন পূর্ব্বক বলিয়া মনে হয়। অবশ্য এ কথা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায়তাতেই চিন্তা করিতে পারিয়াছি, এজন্য তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। এখন দেখা যাক প্রাণবায়ু প্রাণ অবলম্বক কি প্রকারে হইতে পারে, এস্থলে প্রাণ শব্দের অর্থ বল, এই বল অন্নমূলক, সুতরাং ভুক্ত দ্রব্য প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক আমাশয়ে বিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া প্রাণবায়ু প্রাণাবলম্বক বলিয়া কথিত হইয়াছে।

উদান বায়ু।

উদানবায়ু কণ্ঠদেশে অবস্থান করে, এই উদানবায়ুর সাহায্যে মানব কথাবার্ত্তা, গান ও নানাবিধ ধ্বনি করিতে পারে। উদান-বায়ুর উক্ত কার্য্য দেখিয়া মনে হয়, উদানবায়ু কণ্ঠস্থিত স্বরবাহী স্রোতঃচতুষ্টয় আশ্রয় করিয়া থাকে। স্বরবাহী স্রোত চতুষ্টয় সম্বন্ধে সুশ্রুত বলিয়াছেন—"দ্বাভ্যাং ভাষতে দ্বাভ্যাং ঘোষং করোতি।" অর্থাৎ দুইটী স্বরবাহী স্রোত দ্বারা স্বাভাবিক কথাবার্ত্তা বলে এবং অপর স্রোত দ্বয় দ্বারা গভীর ধ্বনি করে।

সমানবায়ু।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পক্বাশয় বায়ুর স্থান, এই পক্বাশয়াশ্রিত বায়ুকে সমানবায়ু বলে। এই সমান বায়ু জঠরানলকে সন্ধুক্ষিত করে, করে, সমান বায়ু সন্ধুক্ষিত জঠরা-নল আমাদের ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করে, পরিপাক ক্রিয়ায় জঠরানলের প্রাধান্য থাকিলেও তাহার মূলীভূত কারণ সমান বায়ুর সন্ধুক্ষণ, এই সমান বায়ু ব্যাপিয়া থাকে; এবং অপান যায়ু উণ্ডুক হইতে সমগ্র স্থূলান্ত্রে অবস্থান করে।

পূর্ব্বে যে পক্বাশয়কে বায়ুর স্থান বলা হইয়াছে, সে কেবল সামান্য ভাবে। নাম ভেদে বায়ুর স্থান বিভাগ করিতে হইলে সমান বায়ুর স্থান ক্ষুদ্রান্ত্র এবং অপান বায়ুর স্থান বৃহদন্ত্র—এই ভাবে স্থান ভাগ করিতে হইবে। এই সমান বায়ু অধো দিকে ক্ষুদ্রান্ত্র এবং উর্দ্ধ দিকে আমাশয় পর্য্যন্ত বিচরণ করে অর্থাৎ পক্বাশয় সমান বায়ুর স্থান; জঠরানল সংক্ষুক্ষণ করিতে গ্রহণী এবং ভুক্ত দ্রব্য হইতে রসকে পৃথক করিতে আমাশয় পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়।

তাই শাস্ত্র কার বলিয়াছেন—"আম পক্বাশয়চরঃ সমনোবহ্নি মঙ্গতঃ, সোহন্নং পচতি তজ্জাংশ্চ বিশেষান্ বিবিনক্তি হি।

আপনবায়ু।

সমান বায়ু প্রসঙ্গে বলিয়াছি অপান বায়ু মলাশয়ে অর্থাৎ স্থূলান্ত্রে অবস্থিতি করে, ঐ অপান বায়ু মল, মূত্র, শুক্র,রজঃ গর্ভ ও আর্ত্তব প্রভৃতিকে অধোদিগে নিঃসারণ করে।

ব্যানবায়ু।

ব্যানবায়ু সর্ব্বদেহচর, এই ব্যান বায়ু কর্ত্তৃক রসরক্তাদি সর্ব্বদেহে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন—হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচ প্রসারণ বেগ বশতঃ হৃৎপিণ্ড হইতে বিশুদ্ধ রক্ত স্রোত দ্বারা সর্ব্বশরীরে পরিচালিত হয়, আয়ুর্ব্বেদের সহিত এ স্থলে মত বিরোধ থাকিলেও সর্ব্বশরীরে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার অবিরোধ আছেই। সুতরাং এ বিষয়ে আমরা উভয়েই তুল্যফলে পরিতৃপ্ত। তবে হৃৎপিণ্ডের সংঙ্কোচ প্রসার• ক্রিয়া যে বায়ু, তাহাও আমরা এই প্রবন্ধেই বলিয়াছি।

বায়ুর এই সমস্ত স্বাভাবিক ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, শারীরিক যাবতীয় ক্রিয়াই বায়ু কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হয় অতএব বায়ুর ক্রিয়া মুহূর্ত্ত বন্ধ থাকিলে জীবগণ জীবন শূন্য হইয়া পড়ে। আর সমভাবে বায়ুর ক্রিয়া থাকিলে জীবগণ শতাধিক বর্ষ জীবিত থাকিতে পারে। এ বিষয়ে মাধবের চরক সংগ্রহ শ্লোক যথা—অব্যাহগতি যস্য স্থানস্থঃ প্রকৃতিস্থিতঃ॥ বায়ুস্যাৎ সোঽধিকং জীবেদ্ বীতরোগঃ সমাঃ সতং॥"

বায়ুর গুণ।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বায়ুর কয়েকটী স্বাভাবিক গুণ কথিত হইয়াছে। এখন আমরা তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।" রুক্ষঃ শীতোলঘুঃ সূক্ষ্মশ্চলোহথ বিশদঃ খরঃ।" শাস্ত্রকারগণ এই রুক্ষাদি গুণ সমূহকে বায়ুর স্বাভাবিক গুণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। রুক্ষগুণ শোষক হইয়া থাকে, বায়ুর যে শোষক শক্তি আছে—তাহা আমরা প্রত্যক্ষই দেখিতে পাই। রাত্রে একখানি আর্দ্রবস্ত্র ফেলিয়া রাখিলে তাহা কেবল বায়ুদ্বারাই শুকাইয়া যায়। ব্যাধি সম্বন্ধে দেখিতে গেলেও দেখা যায় যে, রুক্ষ গুণ প্রকোপিত বায়ু শরীরকে শুষ্ক করিয়া থাকে, যথা জীর্ণ জ্বর ও শোষ প্রভৃতি রোগে বায়ুর আধিক্য থাকে, তাই রোগী ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া পড়ে; ক্ষয়জ বাত প্রকোপ রুক্ষ গুণোদ্ভূত বলিয়াই মনে হয়, কারণ যেখানে ধাত্বাদির ক্ষয় দেখিতে পাই, সেইখানেই শরীরের শুষ্কতা লক্ষিত হয়। রুক্ষতাকে মৃৎতৈজস গুণ বলা যাইতে পারে, সুতরাং রুক্ষগুণ শীত গুণের বৈধর্ম্মী, অতএব এক বায়ুতেই উক্ত উভয় গুণের সমাবেশ বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়, ইহার উত্তরে চরক ও বাগ ভটের টীকাকারগণ বলিয়াছেন যে, শীতগুণ বায়ুর প্রকৃত নয়, কিন্তু উষ্ণগুণে বায়ু প্রশমিত হইবে ইহা বুঝাইবার জন্যই বায়ুর শীত গুণ বলা হইয়াছে; কারণ বিপরীত গুণে বাতাদি দোষের প্রশমন হয় ইহাই হইল দোষ সাম্যের প্রধান নিয়ম। বায়ু লঘু গুণ হেতুক অতি সূক্ষ্ম স্রোতাদির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, অতএব বায়ুর সর্ব্ব ব্যাপকতা সিদ্ধ

হইল। বায়ু যে স্বয়ং গতিশীল তাহা চল গুণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, এবং নিশ্চল পিত্ত কফ ও রস রক্তাদি ধাতুকে স্থানান্তরে নয়ন করিতে বায়ুই যে কর্ত্তা তাহাও অবিসম্বাদী মত, দোষ ধাতু মল মূলক দেহে বায়ুরই যে প্রভুত্ব তাহা স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই।

বায়ুর যে খরত্ব গুণ বলা হইয়াছে; ঐ খর শব্দের অর্থ অমৃদু অর্থাৎ কঠিন, অমূর্ত্ত পদার্থের মৃদু কঠিনতা কল্পনা অসম্ভব হইলেও বায়ু যে রুক্ষতানিবন্ধন শোষণ শক্তি দ্বারা বস্তুগত দ্রবাংশ শুষ্ক করতঃ কঠিনতা উৎপাদন করে, সেই কঠিনতা দর্শন করিয়া বায়ুর খর গুণ কথিত হইয়াছে, অমূর্ত্ত বায়ুর গুণাদি সমস্তই ক্রিয়া গম্য, তাই শাস্ত্রে বায়ুর গুণ কথন প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে "অব্যক্তোব্যক্ত কর্ম্মা চ রজো বহুল এব চ।" অর্থাৎ বায়ু অমূর্ত্ত, কিন্তু বায়ুর কার্য্য দেখিয়া বায়ুর গুণাদি লক্ষিত হয়, বায়ুর অমূর্ত্ততা বশতঃ গুণাবলী লক্ষিত না হইলে বায়ুর গুণ কথনের অন্য প্রয়োজনীয়তা আছে, শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—বায়ু পিত্ত কফ সমগুণ বিশিষ্ট আহার বিহার দ্বারা বর্দ্ধিত হয় এবং বিপরীত গুণ যুক্ত আহার বিহার দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বায়ুর গুণ উক্ত না হইলে গুণের সমত্ব বা বিপরীতত্ব নির্ণয় হইতে পারে না। তদভাবে কোন প্রকার চিকিৎসা কার্য্যই চলিতে পারে না।

এই বায়ুর স্বাভাবিক ক্রিয়া সমূহ আলোচনা করিয়াও বুঝিয়াছি যে, দেহধারণ করিতে হইলে বায়ুর প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বপ্রথম, শরীরের অন্যান্য পদার্থ সমূহের অভাবে যতক্ষণ জীবিত থাকা যায় বায়ু অভাবে তাহার অর্দ্ধক্ষণও জীবন থাকিতে পারে না। অদ্য বায়ুর স্বাভাবিক ক্রিয়াই আলোচিত হইল, অতঃপর পিত্ত ও কফ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাহার পর বায়ু পিত্ত কফ কি প্রকারে রোগোৎপত্তি করে তাহাই বিবৃত করিতে যত্নবান হইব।

দিবোদাস।

[কবিরাজ শ্রীসিদ্ধেশ্বর সামাধ্যায়ী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ]

অখিল-অমর-নিখিল-মানব-শীর্ষ আনত চরণে যাঁর।
একাধারে যিনি নৃপ মহর্ষি ভিষগাচার্য্য-করুণাধার॥
ছেদিতেন যিনি অমরগণের শত জরা-ব্যাধি মরণ পাশ।
ধন্বন্তরি স্বরূপে উদিল আদি দেবাংশ সে দিবোদাস॥
কখন অজিন-আসনে আসীন কখন মুকুতা মুকুট শীর্ষে।
বিজ্ঞানাকাশে ধ্রুবতারারূপে শতেক শিষ্যে মাতাল হর্ষে॥

মহারাজর্ষি দেব দিবোদাস ! উদিলে দ্বাপরে সিদ্ধ ক্ষেত্রে।
বারাণসী ধামে স্থাপিলে রাজ্য নাশিয়া ভদ্র শ্রেণ্য পুত্রে।
অসীম বীর্য্য দরশি ইন্দ্র শতেক নগরী করিল দান।
তাঁহার সকাশে লভিলে শিক্ষা ব্রহ্মা গ্রথিত আয়ুর জ্ঞান ॥
কখন অজিন-আসনে আসীন কখন মুকুতা মুকুট শীর্ষে।
বিজ্ঞানাকাশে ধ্রুবতারারূপে শতেক শিষ্যে মাতালে হর্ষে ॥
নৃপতি "সুদেব" জনক তোমার লভিলে তনয় প্রতর্দ্দনে।
মহিষী "সুযশা" সদৃশী তোমার পুলকিত প্রজা তোমার ধ্যানে ॥
শিষ্য তোমার সুশ্রুত আদি শত শত ঋষি প্রতিভাবান্।
বানপ্রস্থ আশ্রমে থাকি' আয়ুর বিদ্যা করিলে দান ॥
কখন অজিন-আসনে আসীন কখন মুকুতা মুকুট শীর্ষে।
বিজ্ঞানাকাশে ধ্রুবতারারূপে শতেক শিষ্যে মাতালে হর্ষে ॥
শল্য শাস্ত্র প্রচারি' বিশ্বে রচিলে বিশাল আয়ুর তন্ত্র।
খ্যাত "চিকিৎসা দর্শন" নামে ছাইল জগতে যশের মন্ত্র ॥
পুরাণে তোমার ঘোষিল মহিমা মুখরিত বেদ তোমার গানে।
অশীতি হাজার বরষ ব্যাপিয়া পালিলে ধরণী করুণা দানে ॥
কখন অজিন-আসনে আসীন কখন মুকুতা মুকুট শীর্ষে।
বিজ্ঞানাকাশে ধ্রুবতারারূপে শতেক শিষ্যে মাতালে হর্ষে ॥
চতুঃষষ্ঠী কলায় পূর্ণ শাসিলে রাজ্য একচ্ছত্র।
অসূয়ামত্ত দেবতা বৃন্দ তোমার পতনে খুঁজিল ছিদ্র ॥
সুর গুরু মতে বারাণসী হ'তে তিরোহিত হ'ল অনল সূর্য্য।
বিশ্ব-বিজয়ী জ্যোতিতে তোমার সাধিলে যজ্ঞ যাগের কার্য্য ॥
কখন অজিন-আসনে আসীন কখন মুকুতা মুকুট শীর্ষে।
বিজ্ঞানাকাশে ধ্রুবতারারূপে শতেক শিষ্যে মাতালে হর্ষে ॥
একদা যখন বারাণসী ধামে পিনাকীর হ'ল বাসাভিলাস।
সাম দান ভেদ নিপুণ তোমার রাজ্য ছলনে করিল নাশ ॥
প্রবল প্রতাপে গোমতীর তীরে আবার স্থাপিলে শোভন রাজ্য।
আজিও মানব ব্যাধি-বিমুক্ত স্মরি তব নাম দানিয়া আজ্য ॥
কখন অজিন-আসনে আসীন কখন মুকুতা মুকুট শীর্ষে।
বিজ্ঞানাকাশে ধ্রুবতারারূপে শতেক শিষ্যে মাতালে হর্ষে ॥

বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদ।

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ]

যদিও পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার নিকট অতি শিশু বলিয়া পরিচিত এবং সেই শিশু প্রসূত জড় বিজ্ঞান অনাদি-কালের তুলনায় দিনকয়েক মাত্র আমাদের নয়ন পথের পথিক হইয়াছে, যদিও ঐতিহাসিকগণ পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানকে আয়ুর্ব্বেদের পৌত্র আখ্যা দিয়া থাকেন, যদিও কলিকাতার খাতনামা ডাক্তার চার্লস, ভারতের ভূত পূর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার সারজন্ লিকুইস্, আমেরিকার কালিফর্ণিয়া ফ্রান্সিস্কো সহরের জগৎ বিখ্যাত ডাক্তার কার্পেণ্টারস্ এম্ ডি, বহুদর্শী ডাক্তার জর্জ ক্লার্ক এম, এ, এম, ডি, প্রসিদ্ধ অস্ত্র চিকিৎসক ডাঃ মেক্‌লাউড, ডাঃ গার্ব্বি, ডাঃ জেক্‌বি, বার্থ সেণ্টহেনিয়ার প্রভৃতি আমেরিকা, জার্ম্মাণ, ফান্স সুইডেন, ডেনমার্ক ও ইংলণ্ডাদি দেশের বহু নিরপেক্ষ গুণগ্রাহি বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্ব উপলব্ধি করিয়া নানাভাবে আয়ুর্ব্বেদের গুণগান করিয়াছেন, যদিও বেদ অপৌরুষের দৈববাণী বলে ভারতীয় হিন্দু সমাজে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে এবং আয়ুর্ব্বেদকে সেই বেদেরই অন্য-তম অথর্ব্ববেদের একটী অংশ বিশেষ বলিয়া আমরা জানি ও তাহার উপযোগিতা প্রত্যহ শত শত স্থলে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তথাপি যে বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদের প্রতি আমাদের তাদৃশ ভক্তির ভাব পরিলক্ষিত হয় না, তাহা আমাদের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে। আমরা রোগ হইলে প্রথমেই আয়ুর্ব্বেদের অবমাননা করতঃ পাশ্চাত্য চিকিৎসার স্মরণ লইতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করি না! ভারতের গৌরব স্তম্ভ আয়ুর্ব্বেদ আজ ভারত বাসী কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইতে চলিয়াছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করি না, ইহা দেশের দুরদৃষ্ট নহে তো কি!

আমাদের দেশবাসী সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা তো ছাড়িয়াছে, কিন্তু কেহ কি বুকে হাত দিতে বলিতে পারেন যে, বিদেশীয় চিকিৎসা পুরাকাল অপেক্ষা বর্ত্তমানে স্বাস্থ্যের অধিকতর উন্নতি করিয়াছে? এখন চিররোগীর সংখ্যাও যে বৃদ্ধি হয় নাই—এ কথাও কি কেহ বলিতে পারেন? কায়চিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদ অপেক্ষা এলোপ্যাথিতে স্থায়ী সুফল পাওয়া যায়। অথবা যস্য দেশস্য যো জন্তুস্তজ্জেস্তদৌষধং হিতং—এই শাস্ত্রীয় বচনটী অবৈজ্ঞানিক বা মিথ্যা,—সেই জন্য বৃদ্ধ আয়ুর্ব্বেদের গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা হইতেছে। অথবা অন্য কোন কারণ এই আত্ম বঞ্চনার মূলে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এ বিষয়ে বহু জনের বহু মত বিদ্যমান। কেহ কেহ বলেন বর্ত্তমান শিক্ষাই আমাদিগের আত্মবোধ ভুলাইয়া পাশ্চাত্য প্রীতি করাইয়া দিয়াছে, সেই জন্য জাতীয় বিজ্ঞানের আদর আমরা শিখি নাই, এমন কি দেশীয় চিকিৎসক ও না হইলে ভাল হয়, সাহেব ডাক্তার যদি অজ্ঞও হন, তথাপি তাঁহার পদার্পণে আমরা নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ বলিয়া মনে করি, দেশের অবস্থা এইরূপই না দাঁড়াইয়াছে।

অপরে বলেন, অলসতাই আমাদিগকে বাসক পাতা থেঁতো করার হাঙ্গামা অপেক্ষা ৸৹ বার আনা খরচ ক'রে একশিশি এক্ট্রাক্ট অফ্ বাসক ক্রয় করাটাকেই সুবিধা ব'লে মনে করিয়ে দেয় এবং সেই সুবিধার মোহেই আমরা আয়ুর্ব্বেদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই। অপর একদল বলেন, নূতনের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রীতিই পুরাতনের প্রতি বিদ্বেষ জন্মাইয়া দেয়, বিদেশীয়ের নিত্য নূতন আবিষ্ক্রিয়া আমাদিগকে এমন এক নূতন আলোক দান করিতেছে যে, ঐ চিরকেলে বাঁধি বুলি আর ভাল লাগে না, বুনো ঋষিদের কাচকলাখেগো জ্ঞানে আর কুলাইবে না, পাতা থেঁতোর কাল আর এখন নাই, এখন বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির কাল, এখন নিত্য নূতন একটা কিছু চাই—নতুবা চলিবে না। আর একদল আছেন—তাঁহার মনে করেন; রাজশক্তি পশ্চাতে না থাকাই দেশীয় বিজ্ঞানের অবনতির মূল কারণ। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কল্পে যাহা কিছু প্রয়োজন—রাজশক্তির অভাবে তাহা হইতেছে না। অনেকে আছেন যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অফিসে ছুটী না পাওয়ার ভয়ে বাধ্য হইয়া ডাক্তারের আশ্রয় লইয়া থাকেন। রাজশক্তির সহায়ে কোটী কোটী মুদ্রা ব্যয়ে যে বিজ্ঞান আমাদের জাতীয় বিজ্ঞানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে—তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় অর্থহীন শিক্ষায়তন বিহীন পরাধীন কবিরাজগণ্ এখনও যে বড় বড় ডাক্তারের সহিত সমান দর্শনী লইতেছেন, এখনও যে কবিরাজগণ ডাক্তারির ফেরৎ রোগী লইয়াই জীবিকার্জ্জন করিতেছেন—ইহা তাঁহাদের 'সত্যং হি কেবলং বলং'—ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? অনেকে বলেন, স্বদেশিকতার অভাবই আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ। এ দেশে তাদৃশ একজনও স্বদেশ প্রেমিক নাই—যিনি সার্‌ডন্ উড্‌বর্ণ সাহেবের মত বলিতে পারেন যে, আমি আমার সামান্য জীবনের জন্য জাতীয় বিজ্ঞানের অবমাননা করিয়া বিদেশীয় ঔষধ ব্যবহার করিতে চাই না। কেহ কেহ কাল প্রভাব, ধর্ম্মহীনতা, দুরদর্শিতার অভাব, অনুকরণ-প্রিয়তা প্রভৃতি নানা কারণ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্বেষের মূলে অবস্থিত বলিয়া স্বীকার করেন। হাইকোর্টের জর্জ্জ মাননীয় উড্রফ সাহেব ভারতবাসীকে নির্ব্বোধ বলিয়া নির্দ্দেশ থাকেন। সার্‌জন তাঁহার ভারতশক্তি নামক পুস্তকে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রনিধান যোগ্য। তিনি বলেন, যে দেশে—ঘরে-বাহিরে, বনে বাগানে চারিদিকে শত শত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ ছড়ান, সে দেশের লোক ভগবানের অপার করুণাকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। ভারতবাসী পয়সাগুলি বোকার মত তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়া ভারতের প্রকৃতির অনুপযোগী উষ্ণ বীর্য্য ঔষধ ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের দরিদ্রতার বৃদ্ধি ও জাতীয় অপমানকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লয়। ভারতবাসী উষ্ণবীর্য্য ঔষধ ব্যবহারের ফল স্বরূপ নিজেরা ক্রমে হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছে। তিনি অতি দুঃখের সহিত লিখিয়াছেন যে, আমি নিজে স্থায়ি ফলের লোভে আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা করাই, কিন্তু আমার চাকর ভারতবাসী হইয়াও কবিরাজী চিকিৎসা করাইতে রাজী নয়।

যদি কোন সদাশয় ইংরাজ এদেশের গাছ বিলাতে লইয়া সেখান হইতে ঔষধ প্রস্তুত করতঃ ভাল লেবেল লাগাইয়া এখানে পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলেই এদেশে আয়ুর্ব্বেদের পুনরভ্যুদয়ের সম্ভাবনা, নতুবা ঘরের দরজার ঘাস গরুতে খাইবে না। যাঁর প্রাণে একটুও স্বদেশ প্রেম আছে আয়ুর্ব্বেদের মহিমা একটুও অবগত হইতে পারিয়াছেন, ঋষিদের অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তিতে যাঁহার বিশ্বাস আছে, কোন ভারতবাসীকে বিলাতি ঔষধ কিনিতে দেখিলে তাঁহার চক্ষুতে জল না আসিয়া থাকতে পারে না। নিজের জিনিষের প্রতি মানুষের যে একটা স্বাভাবিক প্রীতি, আয়ুর্ব্বেদের বেলায় তাহার বিপরীত ভাব লক্ষিত হয় কেন? এ বিষয়ে আমাদের দেশের চিন্তাশীলগণের অভিমত ব্যক্ত করিলাম, কিন্তু আমার মনে হয়, আমাদের বুঝিবার ত্রুটিই ইহার কারণ। যতদিন আয়ুর্ব্বেদের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বি ছিল না ততদিন আয়ুর্ব্বেদের উপর অবিশ্বাসের কোন কারণই উপস্থিত হয় নাই, অতএব ইহার উন্নতির কোন ব্যাঘাতও ঘটে নাই। যখনই নূতন বিজ্ঞান আসিয়া তাহার সাফল্যের চিহ্নস্বরূপ রেল ষ্টীমার প্রভৃতি কতকগুলি চমকপ্রদ বাহিরের দৃশ্য আমাদের সম্মুখে ধরিল, অমনি আমাদের হৃদয়ে আয়ুর্ব্বেদের প্রতি অবিশ্বাসের বীজ হৃদয়ে উপ্ত হইতে লাগিল। এই জড় বিজ্ঞানকেই একমাত্র সত্যের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া আমাদের সংস্কার জন্মিয়া গেল। বিজ্ঞানই যে জ্ঞানের চরম, প্রজ্ঞান বলিয়া যে আর একটা জিনিষ আছে, সে কথা বিস্মৃতির জ্ঞান গর্ভে ডুবিয়া গেল। প্রজ্ঞানের সফলতা যথা,—বিনা যানে শূন্য পথে বিচরণ, বিনা তারে সুদূরের সংবাদ লওয়া ক্ষণ মাত্র ধ্যানস্থ হয়ে ভূত ভবিষ্যতের ঘটনা প্রকাশ করা, একবিন্দু কোশার জলে মৃত ব্যক্তির জীবন দান প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দেখাইয়া যোগ বলের মাহাত্ম্য প্রচার করার মত লোক বর্ত্তমানে বিরল। কাজেই বিজ্ঞানের উপযোগিতা যথেষ্ট থাকিলেও সে যে প্রজ্ঞানের নীচের ধাপের জিনিস, একথা অনুভব করার সুযোগ আমাদের ঘটে না।

সুদূর অতীত কালের শিক্ষা-প্রণালী বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর সহিত খাপ খায় না, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানকে জড় বিজ্ঞান দিয়ে বোঝা যায় না। প্রত্যক্ষের পথ দিয়া জড় বিজ্ঞানকে বোঝা যত সহজ, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানকে বোঝা তত সহজ নয়। অধ্যাত্ম বিজ্ঞান সম্যক বুঝিতে হইলে যোগ বল চাই, কিন্তু আমাদের সে সাধনা নাই। অথচ জড় বিজ্ঞান অন্ধের মত শাস্ত্রের কথা শুনিতে দেয় না। আর আমাদের শাস্ত্রকার বলিতেছেন—

পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গবেদ চিকিৎসিতং
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ ॥

এই খানেই ঋষিদের সঙ্গে প্রত্যক্ষবাদীর প্রথম বিরোধ। এমন কোন যুক্তি প্রত্যক্ষবাদীরা পান না—যাহার দ্বারা যথোক্তানুগমনকই শ্রেয় বলিয়া মানিয়া লইতে পারে। অতএব ঋষিদের এইরূপ উপদেশকে চিন্তার স্বাধীনতাপহারক বলিয়া মনে করে ও তজ্জন্য গালিবর্ষণেরও ত্রুটি করেন না। বিজ্ঞান—জ্ঞানকে ক্রম বিকাশশীল বলিয়া স্বীকার করেন। আয়ুর্ব্বেদের ক্রমবিকাশ নাই। আমরা এ যুগেও যে সকল উন্নততর জ্ঞানের প্রকাশ হইতে দেখিতেছি তাহাও ক্রম বিকাশের ফলে হয় নাই, হঠাৎ

হইয়াছে। বুদ্ধ, চৈতন্য, খৃষ্ট প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়া যে সকল সত্য—জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, সে সকলের টীকা টিপ্পনী ব্যাখ্যা সমালোচনা প্রভৃতি হইয়াছে মাত্র, আসল সত্যগুলির কোনই উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। কেন এ দেশের মনীষীগণ সত্যকে ভগবৎ স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কেনই বা বেদকে অপৌরুষের ভগবদ্ বাণী বলেন এবং ভগবৎ বাণী কিরূপে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়—এ সকল কথা আমাদের বুদ্ধিতে আসে না বলিয়া আমরা আয়ুর্ব্বেদের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না। চরক খুলিলে প্রথমেই দেখিতে পাই যে, ভরদ্বাজমুনি অমরনাথ ইন্দ্রের নিকট চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। মানুষ স্বশরীরে দেবতার কাছে যাইতে পারে, এমন কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র অদ্যাবধি সৃষ্ট হয় নাই। অতএব এ বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া খুবই স্বাভাবিক। হয়, অমর নাথ সম্বন্ধে আমাদের যে একটা বড় রকম ধারণা আছে—সেটাকে ছোট ক'রে আধুনিকের মতানুযায়ী মঙ্গোলিয়াকেই স্বর্গ রাজ্য বলিয়া মানিয়া হইতে হইবে, নতুবা স্বীকার কর্ত্তে হবে—বিজ্ঞান শক্তি অপেক্ষা কোন বড় শক্তি সেকালে ঋষিদের ছিল—যার দ্বারা অসাধ্য সাধন হইতে পারিত। শাস্ত্রকার জ্বরোৎপত্তি বিষয়ে বলিতেছেন,—

"দক্ষাপমান সংক্রুদ্ধ রুদ্র নিশ্বাস সম্ভবঃ"

ক্রুদ্ধ রুদ্রের নিশ্বাস থেকে জ্বরের উৎপত্তি হইয়াছিল;—ইহার মূলে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আছে কিনা? শারীরিক ক্লেশকর কতকগুলি লক্ষণ সমন্বিত অবস্থা বিশেষকে আমরা জ্বর বলিয়া জানি। সে কিরূপে রূপ ধারণ করিয়া করযোড়ে মহাদেবে কাছে দাঁড়াইল? "জ্বরস্ত্রিপাদঃ ত্রিশিরা ষড়্ভুজো নবলোচনঃ, ভস্মপ্রহরণঃ রৌদ্রঃ কালান্তক যমোপমঃ॥" শাস্ত্রকারগণ এই যে রূপের বর্ণনা করিয়াছেন—উহা কাল্পনিক অথবা জ্বরের যে জীবাণু বর্ত্তমানে বাহির হইয়াছে তাহার রূপ ঐ প্রকার? মহাদেবই বা কে? ইনি কি প্রাচীন কোন্ ভীল, নাগা প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতির পুরুষ, অথবা জগতের সংহার কর্ত্তা দেবাদিদেব মহাদেব? এই সকল অলৌকিক ব্যাপার আমরা লৌকিক দৃষ্টিতে বুঝিতে পারি না। আয়ুর্ব্বেদের যাহা মূল উপাদান—বায়ুপিত্তকফ, কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র এখনও তাকে ধর্ত্তে পারে নাই। অতএব যদি প্রত্যক্ষবাদীর জড়বিজ্ঞানকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার কর্ত্তে হয়, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদকে বিশ্বাস করা চলে না। যার আধুনিক বিজ্ঞানে যত বেশী প্রীতি জন্মাইবে, আয়ুর্ব্বেদের প্রতি তার তত বেশী অবিশ্বাস হওয়াই স্বাভাবিক, কেন না প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান উভয়ে পরস্পর বিভিন্ন পথ দিয়ে জ্ঞানের অন্বেষণে চলিয়াছে।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

আয়ুর্ব্বেদ বলেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরই আমাদের দেহে বায়ুপিত্ত কফরূপে সৃষ্টি স্থিতি সংহার কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ঋষিরা আমাদের চিত্ত বৃত্তিকে ভগবদভিমুখী করাইয়া জড়ের মধ্যেও চেতনের অস্তিত্ব অনুভব করাইতেছেন। তাই তাঁহারা বলিতেছেন—

সহি ভগবান্ প্রভবশ্চাব্যয়শ্চ ভূতানাং ভাবা-
ভাবাকরঃ সুখাসুখঃ

বিধাতা মৃত্যুর্যমো নিয়ন্তা প্রজাপতিরদিতি
বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বরূপঃ
সর্ব্বগঃ সর্ব্বতন্ত্রানাং বিধাতা ভাবানামনুর্বিভু
বিষ্ণুঃ ক্রান্তা লোকানাং বায়ুরেব ভগবানিতি।

আর পাশ্চাত্যবিজ্ঞান জীবাণু লইয়া আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ধরিতেছেন, এই প্রত্যক্ষকে অবিশ্বাস করিয়া প্রাচীন অসভ্য যুগের ঋষির কথামত অপ্রত্যক্ষকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করার মত ভক্তি আমাদের নাই। জীবাণু যে নীচের ধাপের জিনিস, জীবাণুর দিকে দৃষ্টি করিলে যে নীচের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়, ভগবানের দিকে দৃষ্টি যায় না, প্রকৃত স্বাস্থ্য যে আমাদের মতে কেবল শরীর সংরক্ষণ নয়; মুক্তিই যে প্রকৃত স্বাস্থ্য এবং তাহার বিঘ্ন স্বরূপ বলিয়া জরাদির প্রতিকার আবশ্যক,—সে কথা আমরা ভুলিয়া যাই। কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ডে বক্তৃতা কালে কেন বলিয়াছিলেন যে দি ইষ্টারন্ সায়েন্স বিগিন্স্ হিয়ার দি ওয়েষ্টারণ সায়েন্স এণ্ডস্", পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যেখানে শেষ,প্রাচ্য বিজ্ঞান সেইখান থেকে আরম্ভ, সে কথা ভারতের প্রকৃতি ও বিশেষত্ব না জান্লে বোঝা যায় না। "মুনয়ো হি তপোযোগর্দ্ধি বলাৎ ত্রৈকালিক নিখিল জ্ঞান শালিনঃ পুরুষাতিশয়া উচ্যন্তে"—এই কথাটীকে অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে করি। আমাদের শক্তি বর্ত্তমানে এত কম যে, অত বড় কথা আমাদের কল্পনায়ও আসে না। আমরা বুঝিতে পারি না যে, তপস্যা ও যোগবলে মানুষ কি করিয়া ত্রিকালজ্ঞ হইয়া অলৌকিকশক্তি লাভ কর্ত্তে পারে। আমাদের ধারণা সুরেশ সর্ব্বাধিকারী, বার্ড সাহেব প্রভৃতির মত বিজ্ঞ লোকগণই পরবর্ত্তী যুগের লোকের কাছে ঋষিতে দাঁড়ায়। যাঁহারা একালের যোগী ত্রৈলিঙ্গ স্বামীকে দেখিয়াছেন, তাঁর অলৌকিক কার্য্য কলাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই যোগবল বিশ্বাস কর্ত্তে পারেন। আর যোগবল বিশ্বাস করেছিলেন—কর্ণেল অলকট সাহেব। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে,একজন সামান্য সন্ন্যাসীর মধ্যেও কি অদ্ভুত ক্ষমতা থাকিতে পারে।

"যদি হাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি নতৎ ক্বচিৎ" ঋষির এই কথা শুনিয়া যাঁরা অন্ধ ভক্ত, চরক খানা ভাল করে পড়ায় উৎসাহ তাঁদের বাড়তে পারে, কিন্তু যাঁদের বিবেক আছে, নবীন জ্ঞানালোক যাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাঁদের ঐ দম্ভোক্তি দেখে ঘৃণায় চরকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যেতে হয়, চরক খুলবার প্রবৃত্তিও আর থাকে না। এই মিথ্যা প্রবঞ্চনার যুগে প্রত্যেক অণু পরমাণু যাদের মিথ্যা দ্বারা কলঙ্কিত, তারা কেমন করে বিশ্বাস কর্ব্বে যে, ঋষিরা কোন স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া বেশী বই বিক্রয় হওয়ার আশায় এরূপ অলীকের অবতারণা করেন নাই। অতএব বেদ কি? আপ্তঋষি কাহাকে বলে, বেদে ও বিজ্ঞানে বিরোধ স্থলে কার কথা সত্য বলে মাথায় পাতিয়া লইব? বায়ুপিত্ত কফ জিনিষটা কি? কেনই বা ঋষিরা বায়ুপিত্ত কফের উপর আয়ুর্ব্বেদের ভিত্তি স্থাপন করেছেন? যদি কোন বিজ্ঞ কবিরাজ এ সকল বিষয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশদ ভাবে উপযুক্ত যুক্তি প্রমাণ দেখিয়ে আয়ুর্ব্বেদে বিশ্বাসের কারণ নির্দ্দেশ করিয়ে দেন তাহা হইলে আশা করি স্রোত ফিরলেও ফিরতে পারে।

জ্ঞান আমরা দুই ভাবে লাভ করি,—স্বভাবজাত জ্ঞান ও বাহিরের সংগৃহীত জ্ঞান। দেখে শুনে অভিজ্ঞতায় যে জ্ঞান জন্মে—তাহা বাহিরের জ্ঞান, তাহাতে অনেক যুক্তিতর্ক প্রমাণের আবশ্যক হয় এবং সে জ্ঞানের কিছু স্থিরতা নাই, যিনি যখন যত বেশী যুক্তি দেখাইতে পারিবেন, তাঁহার কথাই তখন সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে। এইরূপে ক্রম বিকাশের পথে এই বাহিরের জ্ঞান চলিতেছে, ইহাকেই বিজ্ঞান বলে।

ভিতরের যে জ্ঞান সে কেবল যুক্তি তর্কের অপেক্ষা করে না; যেমন মনে করুন, আপনার ক্ষুধা পাইয়াছে কোন বাহিরের অভিজ্ঞতা এ ক্ষুধাকে আনে নাই, যে মুহূর্ত্তে আপনার শরীরে আহার্য্যের প্রয়োজন হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে ক্ষুধারূপী ভগবান আপনাকে আহারের জন্য বলিতেছেন; বাহিরের শতযুক্তিও ক্ষুধাকে মিথ্যা কর্ত্তে পারবে না।

জ্ঞানরূপী ভগবান্ সর্ব্বদা আমাদের অন্তরে থাকিয়া সদসৎ জ্ঞান দান করিতেছেন, সেই ভগবৎদত্ত স্বয়ম্ভুত জ্ঞানই বেদ। যাঁর চিত্ত যত স্থির, মলিনতা শূন্য, তিনি অন্তরাত্মার বাণী তত বেশী স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারেন। যখন আমরা একটী পাত্রে জল রাখিয়া চন্দ্রগ্রহণ দর্শন করি, তখন যদি সেই পাত্রের জল মলিন অথবা চঞ্চল হয়, তাহা হইলে তাহাতে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব ঠিক ভাবে পড়ে না, সেইরূপ রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা আচ্ছন্ন চিত্তের উপর সত্যের শাশ্বত মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয় না। সেই জন্য নিজের বিবেকের দোহাই দিয়া কোন ঋষির শাস্ত্রের উপর কলম চালাইবার পূর্ব্বে নিজের চিত্তশুদ্ধি সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। মনে করুন, আপনি আহার করিতে বসিয়াছেন, সে সময়ে যদি আপনার চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকে অথবা আহার্য্য বস্তুর প্রতি লোভ বেশী জন্মায়, তাহা হইলে ঐ রজো ও তমো গুণের কার্য্য বিক্ষেপ ও লোভ দ্বারা চিত্ত আচ্ছন্ন থাকায় আপনি আহারের যথার্থ পরিমাণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। ফলে অধিক আহার জন্য ব্যাধি আপনাকে কষ্ট দিবেই, যেমন স্থূল বিষয়ের জ্ঞানেও চিত্ত শুদ্ধি আবশ্যক, সেইরূপ সমস্ত জ্ঞানেরই সত্যতা নির্ভর করে—রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা অনাক্রান্ত চিত্তের উপর এবং সেই রজস্তমো গুণ থেকে মুক্ত হতে হইলে চাই কঠোর সাধন। সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ কর্ত্তে পারলেই আপ্ত পুরুষ হওয়া যায়, তিনিই সত্যের আবিষ্কার করিতে সমর্থ, তাঁর সেই নির্ম্মল চিত্ত কোন বিচার বিতর্ক ব্যতিরেকে আপনা হইতে যে জ্ঞান উত্থিত হয়, তাকেই আপ্ত বাক্য বলিয়া মাথা পাতিয়া লইতে হইবে, আসল কথা ঋষিরা মিথ্যাবাদী ছিলেন না, তাঁদের অবিশ্বাস ক'র না। অসত্য রজস্তমো গুণের কার্য্য, রজস্তমো শূন্য স্থানে অসত্যের স্থান নাই।

রজস্তমোভ্যাং নির্ম্মুক্তা স্তপো জ্ঞান বলেন যে,—

"যেষাং ত্রৈকালং অমলং জ্ঞানমব্যাহতং সদা
আপ্তা শিষ্টা বিবুদ্ধা স্তে তেষাং বাক্যমসংশয়ং
সত্যং বক্ষ্যন্তি তে কস্মাৎ অসত্যং নীরজস্তম' ॥

এই দার্শনিক সত্যটার উপর নির্ভর করিতেছে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ প্রীতি এবং এই প্রীতির উপর নির্ভর করিতেছে তাহার প্রতিষ্ঠা। ইংরাজীতেও একটা কথা আছে যে, "কন্‌সেন্স ইজ্ দি ভয়েজ অফ্ গড্" কিন্তু রজস্তমো

গুণের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে না পারিলে যে ঈশ্বরের বাণী সম্যক উপলব্ধি করা যায় না—একথা আমাদের ঋষিরাই ভালরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই আমাদের সাধারণ গোড়ার কথা হচ্ছে সংযম। অনেকে মনে করেন বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মত আয়ুর্ব্বেদও বাহ্য পরীক্ষা দ্বারা স্থিরিকৃত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের ঋষিরা যে স্বানুভূতি ও জগতের পরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন—একথা দার্শনিকগণ স্বীকার করিবেন। আত্মানুমেয় জ্ঞান যেমন বসন্তে "নিম্বভোজনং" বসন্ত কালে নিম্ব ভোজন করিবে। কেন? এই প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক যুক্তিপূর্ণ উত্তর আসার পূর্ব্বেই আমাদের দেশে ঘরে ঘরে নিমের ঝোল রাঁধিতে আরম্ভ করে। বসন্ত কালের কচি কচি নিম পাতা যেন সন্দেশের চেয়েও মুখরোচক হয়। কেন হয়? আত্মা তার প্রকৃতিগত বৈষম্য নিবারণের উপাদান সংগ্রহের জন্য নিম্ব চায়, সেই জন্য বসন্তে তিক্ত নিমও মধুর হয়ে দাঁড়ায়। এই যে আত্ম প্রত্যয় সিদ্ধজ্ঞান, এই জ্ঞানই ত্রিকালে অব্যাহত আপ্ত ঋষির জ্ঞান, বিজ্ঞান এরূপ জ্ঞানের আমল দেয় কিনা জানিনা।

"জ্বরন্ত পূজনৈর্বাপি সহসৈবোপশাম্যমি বিষ্ণুং সহস্রমূর্দ্ধানং চরাচরপতিং বিভুং স্তবন নাম সহস্রেন জ্বরান্ সর্ব্বান ব্যপোহতি।

মহাদেবের পূজায় বা বিষ্ণুর সহস্র নাম কীর্ত্তনে জ্বর বন্ধ হইতে পারে—এরূপ বৈজ্ঞানিক যুক্তি এখনও পাওয়া যায় না বলিয়া কি আমরা ঋষির এরূপ উপদেশ শুনিব না? আয়ুর্ব্বেদে দৈব ব্যপাশ্রয় বলিয়া যে চিকিৎসা আছে, তাহার দ্বারা আমরা অনেক সময়ে অনেক রোগীর রোগ মুক্ত হইতে দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখনও দৈব ব্যপাশ্রয় চিকিৎসার সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। 'পূর্ব্ব রূপ' বলিয়া আয়ুর্ব্বেদের যে একটী উপাদেয় রোগ জ্ঞানের উপায় আছে, যাহার দ্বারা রোগ জন্মাইবার বহু পূর্ব্ব থেকে ভাবি রোগের বিষয় অবগত হওয়া যায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এতকালের গবেষণায় তাহার অনুসন্ধান পাইয়াছেন কি? যে মেহ রোগের প্রবল অবস্থায় প্রস্রাবের 'সুগার' দেখাইয়া তাঁহারা কৃতিত্ব দেখাইতেছেন, ঋষিরা মেহ জন্মাইবার বহু পূর্ব্বে মুখে সুগার পাইয়াছেন। তাই তাঁহারা বলিয়াছেন।

দন্তাদীনাং মলাচ্যত্বং প্রাকৃরূপং পানি পাদয়োঃ,
দাহ শ্চিক্কণতা দেহে তৃট্ স্বাদ্বাস্যঞ্চ জায়তে॥

যে সকল চিকিৎসা-তত্ত্ব অদ্যাবধি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বাহির করিতে পারেন নাই, ঋষিরা বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সে সকল বিষয় যোগ বলে অবগত হইয়াছিলেন। সুখের বিষয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ক্রমোন্নতির ফলে আয়ুর্ব্বেদের নির্দ্ধারিত সত্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এত দিন পরে শোথে লবণ জল নিষেধ—এই সত্যটী পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পাইয়াছেন। ছাগ মাংস যে যক্ষার জীবাণুনাশক তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঋষিরা কি প্রকারে এই সকল সত্য অবগত হইয়াছিলেন—তাহা ভাবিলে কাহার না মস্তক আপনা থেকে ঋষিদের পায়ে নামিয়ে পড়ে। ঘরের ঝুল, বিড়ান বিষ্ঠা, নরমূত্র প্রভৃতি অনেক জিনিস আছে—যাদের নাম শুনিলে ঘৃণায় আমাদের চক্ষু কপালে উঠিয়া যায়, ঋষিরা তাদের মধ্যেও জীবনী শক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন। অবস্থা বিশেষে ঐ সকল দ্রব্য দ্বারাও যে আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন

হইতে পারে—তাহার উপায় নির্দ্ধারণ তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন।

গুরুজনের সম্মান রক্ষার মধ্যেও স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ আছে, তাই নিদান বলিতেছেন"প্রধর্ষনং দেব গুরু দ্বিজানাং" দেবগুরু বিপ্রের অবমান নায় উন্মাদ রোগ জন্মে। একথা কেবল ঋষির মুখেই শোভা পায়, প্রত্যক্ষবাদীরা ইহা বুঝিতে পারিবেন না।

স্বপ্নও যে ভাবি রোগের সন্ধান বলিয়া দিতে পারে, এ জ্ঞান একমাত্র ঋষিরাই লাভ করিয়াছিলেন।

স্বপ্নেষু কাক শুক শল্লকী নীলকণ্ঠা
গৃধ্রাস্তথৈব কপয় কৃকলাসকাশ্চ
তং বাহয়ান্তি সনদী বির্জলাশ্চ পশ্যেৎ
শুষ্কাং স্তরুন্ পবন ধুম দবার্দ্দিতাংশ্চ॥

যদি কেহ এইপ স্বপ্ন দেখে—যেন কাক শুক সজারু, ময়ুর, শকুনি, বানর ও কাঁকলাস ইহারা প্রাপ্ত হইতেছে অথবা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে এবং নদী সকল যেন জল শূন্য হইয়াছে, শুষ্ক বৃক্ষগণ ঝড় বাতাস ধুম ও দাবাগ্নি দ্বারা যেন আকুলিত হইতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—ঐ ব্যক্তি শীঘ্রই যক্ষা দ্বারা আক্রান্ত হইবে। আয়ুর্ব্বেদের অরিষ্ট জ্ঞান কিরূপ সুন্দর একটী দৃষ্টান্ত দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। কোন একজন কবিরাজ রোগী দেখিতে যাইতেছেন, আমি শিক্ষার্থীরূপে তাঁহার সহিত ছিলাম। রোগীর বাড়ীতে প্রবেশ করিতে গিয়া একজন পুরোহিতকে নারায়ণ হস্তে বাহির হইতে দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় একটু ভীত ভাবে তথায় দাঁড়াইলেন, আমি তাঁহাকে এইরূপ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে নিম্নলিখিত শ্লোকটী শুনাইলেন,—

প্রবেশে পূর্ণ কুম্ভাগ্নি মৃদ্বীক্ত ফল সর্পিষাং
বৃষ ব্রাহ্মণ রত্নানাং দেবতানাং বিনির্গতিং
অগ্নিপূর্ণানি পাত্রানি ভিন্নানি বিশিখানিচ
ভিষঙ্মুমূর্ষতাং বেশ্ম প্রবিশন্নেব পশ্যতি॥

যাহা হউক রোগী দেখিয়া মৃত্যুলক্ষণ কিছুই পাওয়া গেলনা। সামান্য জ্বর হইয়াছে দেখিয়া আশ্বস্ত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে চরকের প্রতি একটু অশ্রদ্ধাও আসিল এবং ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া কবিরাজ মহাশয় নিশ্চিন্ত মনে গৃহে ফিরিলেন। হঠাৎ রাত্রি ৮ টার সময় রোগীর বাড়ী হইতে লোক আসিয়া বলিল, "কবিরাজ মহাশয় শীঘ্র আসুন রোগী কেমন করিতেছে।" তখন গিয়া যাহা দেখা গেল তাহাতে চরকের প্রতি অপরিসীম ভক্তি জন্মাইয়া দিল,—ব্রাহ্মণ দেবতা প্রভৃতি বহির্গমনের সহিত রোগের, রোগীর ও মৃত্যুর কি সম্বন্ধ আছে—কেনইবা তাহার অরিষ্ট লক্ষণ সূচিত করে, এ সকল কথা পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞান প্রত্যহের পথ দিয়া বুঝাইতে পারুক আর না পারুক, এই ব্যাপারে ঋষির অলৌকিক জ্ঞানের প্রতি আমাদের যে অটল বিশ্বাস জন্মিয়াছে, কোন যুক্তিই আমাদের যে বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেনা। তাই বলি বাহ্যাড়াম্বরে মুগ্ধ হইয়া পৈতৃক সম্পত্তি ছাড়িওনা, বিদেশী ঔষধ ব্যবহারের পূর্ব্বে ভারত তোমার জন্মভূমি, প্রাচীন আর্য্যগণ তোমারই পূর্ব্বপুরুষ—একথাটী একবার স্মরণ করিও। আর ভাবিয়া দেখিও যাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া তুমি চলিতেছ, ঋষিরা তোমারই কল্যাণের জন্য কঠোর সাধনায় তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

বৈদ্যের কথা।

[শ্রীভোলা পদ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ।]

(১)

রথযাত্রার দু'দিন বাকী;
যাত্রীরা সব পুরী চলে।
পুণ্য তা'দের বৃদ্ধি পা'বে,
শ্রীজগন্নাথ দর্শন-ফলে॥

(২)

মহেশপুরের যাচ্ছে নিতাই
বিন্দু, মাখন, সর্ব্বানী,
বিত্তারম্ভ দিচ্ছেন সাহস,
হ'য়ে সবার অগ্রণী॥

(৩)

এমন সময় মধু বৈদ্য
একটী অনাথ রোগীকে
ঔষধ-পথ্য প্রদান করি,
চলেন সবার অলক্ষ্যে।

(৪)

বিত্তারম্ভ বড়ই চতুর,
বলেন ওহে কবিরাজ!
উপার্জ্জন তো খুব ক'রেছ,
কর কিছু ধর্ম্ম কাজ।

(৫)

প্রতি বৎসর বল কেবল
হাতে এখন আছে রোগী,
পথের সম্বল চাইত কিছু
(নচেৎ) ভুগবে শুধু কর্ম্মভোগই॥

(৬)

বৈদ্য আসি সসম্ভ্রমে
গ্রহণ করি পদধূলি।
(বলেন) আদেশ তোমার হে ব্রাহ্মণ
নিলাম আমি শিরে তুলি॥

(৭)

এবার আমার মহাভাগ্য,
পল্লীবাসী সুহৃ সবে।
দর্শন ক'রে শ্রীজগন্নাথ
জীবন আমার ধন্য হ'বে॥

(৮)

বিত্তারম্ভ পূর্ণানন্দ
হেরি বৈদ্যের ধর্ম্মমতি।
শুভক্ষণে যাত্রা করেন
উৎকলীয় তীর্থ প্রতি॥

(৯)

যথাকালে বাষ্পীয় যান
যাত্রিগণে বক্ষে ধরি'।
দ্রুতগতি হ'ল আসি—
প্রাপ্ত হয়ে পুণ্যপুরী॥

(১০)

পুরীর গগন সাগর তপন
আজি কেমন মধুর উজল।
গন্ধবহ মৃদুমন্দ
জল-গগনের পরাণ উতল॥

(১১)

আজি ওগো শুভক্ষণে
শ্রীজগন্নাথ জগৎ শরণ।
সসুভদ্রা বলভদ্র
কর্ব্বেন ওগো রথারোহণ॥

(১২)

বিষ্টারম্ভ সাথী সহ
চলেছে ঐ সসত্বরে।
বর্ত্মে তাদের একটী শিশু
যাচিছে জল করুণস্বরে॥

(১৩)

রাক্ষসী ঐ বিসূচিকা
গ্রাসি তাহার জননীরে।
করাল দৃষ্টি নিক্ষেপিছে
ক্ষুদ্র শিশুর প্রাণোপরে॥

(১৪)

বিষ্টারম্ভ সম্বোধিয়া
বলেন আপন সঙ্গীগণে,
"শীঘ্র চল, শীঘ্র চল
রথের ধ্বনি পাই শ্রবণে॥"

(১৫)

মধু বৈদ্য বলে "প্রভো
রথের ধ্বনি নাহি শুনি।
অনাথ আতুর মাগে ঐ জল—
বালক বলে অনুমানি"।

(১৬)

বিষ্টারম্ভ বলেন "মধু,
এই কি তোমার বুদ্ধি বটে!
শীঘ্র চল, সময় যে যায়
ক্রোশের অধিক রাস্তা বটে।"

(১৭)

বৈদ্য বলেন,—"পাপী আমি
দেবের দর্শন হ'লনা আর।
যন্ত্রণাতে কাঁদছে বালক,
আশ্রয়ে হায় দে'ব কা'র॥

(১৮)

বিষ্টারম্ভ ক্ষুব্ধ মনে
লয়ে আপন সঙ্গীগণ।
অগত্যা যে গেল চলি
যথায় রথে নারায়ণ।

(১৯)

যথাকালে মোহনবেশে
শ্রীজগন্নাথ রথোপরে,
আরোহিলেন, ভক্তবৃন্দ
হর্ষে জয়ধ্বনি করে।

(২০)

বিষ্টারম্ভ নির্নিমেষে
হেরিছেন ঐ সবার আগে—
মধুবৈদ্য বসে আছে
রথেরি ঠিক পুরোভাগে॥

ম্যালেরিয়া।

[কবিরাজ শ্রীতারিণীচরণ সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ন]

উৎপত্তি।—সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া-বিষ তৃণপর্ণাদিযুক্ত ভূমি হইতে উদ্ভূত হয়। গ্রীষ্ম প্রধান দেশের ক্ষেত্রস্থ, লতা, গুল্ম, তৃণপর্ণাদি, বৃষ্টি কিম্বা নদীর বন্যাতে ডুবিয়া পচিতে থাকে এবং তৎপরে জল অপসারিত হইলে সূর্য্যের উত্তাপে এই সমুদায় গলিত দ্রব্য হইতে এই ম্যালেরিয়া-বিষ উৎপন্ন হয়; এই সময় যতই সূর্য্যের উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, ততই ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ হইয়া থাকে। স্থানীয় উত্তাপ ৬০ ডিগ্রীর (ফেরেন হীট) কম হইলে, কদাচিৎ ম্যালেরিয়া-বিষ জন্মাইতে পারে। এই ম্যালেরিয়া-বিষ জলীয় বাষ্প (moisture) সাহচর্য্যে প্রসারিত হয়; জলীয় বাষ্প অতিরিক্ত হইলে, এই বিষ শোষণ করিয়া লয়, সুতরাং ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হইতে পারে না। আবার যদি এই জলীয় বাষ্প না থাকে, তাহা হইলেও ম্যালেরিয়া-বিষ জন্মাইতে পারে না। এখন দেখা যাইতেছে যে, প্রথম তৃণপর্ণাদিযুক্ত ভূমি; দ্বিতীয় কিছুকাল স্থায়ী সূর্য্যের কিরণ; তৃতীয়, যথাপরিমাণ জলীয় বাষ্প, এই তিনটীর সমবায়ী কারণে ম্যালেরিয়া বিষ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই বিষ নিঃশ্বাসের সহিত ফুসফুস ও পাকাশয় এবং সম্ভবতঃ লোমকূপের ভিতর দিয়া শরীর মধ্যে প্রবেশ করে; পরে রক্ত ও স্নায়ুমণ্ডলীর উপর বিষক্রিয়া প্রকাশ করিয়া জ্বর উৎপন্ন করে।

ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে আধুনিক মত।—১৯০০ খ্রীঃ অঃ লণ্ডন স্কুল অবট্রপিকেল ডিজিজেস (London School of Tropical Diseases) স্থির করিয়াছেন যে, এক প্রকার জীবাণু বিশেষ (parasite) এই রোগের সৃষ্টির কারণ; এই জীবাণু কোন ক্রমে মনুষ্য দেহে প্রবেশ লাভ করিলে ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণ সকল প্রকাশ করিয়া থাকে। এনোফিলিস (Anopheles) জাতীয় মশক এই ম্যালেরিয়া বিস্তারে যথেষ্ট সহায়তা করে। যে কোন কারণে এই মশককুলবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই সকল কারণেই ম্যালেরিয়াও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে মশককুলেরও সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই ম্যালেরিয়া জীবাণু দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কতিপয় দিবসের মধ্যে জ্বর উৎপন্ন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে শরীরের মধ্যে অবস্থিতি করে; ঔষধ প্রয়োগ ইত্যাদি দ্বারা জীবাণু সমূহ সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস প্রাপ্ত না হইলে অল্প বা বহুদিনের মধ্যে পুনরায় জ্বর উৎপন্ন করিয়া থাকে।

এদেশে সচরাচর দুই জাতীয় মশক দেখিতে পাওয়া যায়; এক জাতীয়কে কিউলেক্স্ (culex) এবং অপর জাতীয়কে এনোফিলিস (Anopheles) কহে। এই এনোফিলিস মশকের দেহে ম্যালেরিয়া-জীবাণু পরিপুষ্ট হইয়া ইহার মুখাভ্যন্তরে লালা-নিঃসরণকারী গ্রন্থিতে অবস্থিতি করে। এই মশকের দংশনে ম্যালে-

Imp. 3948
dt. 31/8/09
RARE BOOK

রিয়া জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপর জাতীয় এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ; উভয় জাতির মধ্যে প্রভেদ এই যে, কিউলেক্স্ দেওয়ালে বসিলে তাহার দেহের সহিত দেওয়ালের সমান্তরাল রেখা সংস্থাপন করে; কিন্তু এনো-ফিলিস দেওয়ালে বসিলে দেহের সম্মুখ ভাগ নিম্ন ও পশ্চাদ্ভাগ উন্নত হইরা থাকে; ইহা-দিগকে স্থির জলাভূমি ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতে দেখা যায় এবং তথায় ইহারা বংশ বৃদ্ধি করে।

এনোফিলিস। কিউলেক্স।

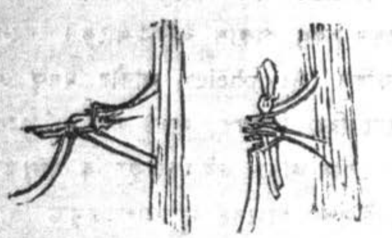

গত ১৯০৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাই নগরে মেডিকেল কংগ্রেসে প্রফেসার রোনাল্ড রস্ যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

Malaria is due to miasma given off by marsh; but the maisma is not a gas or vapour—it is a living insect. The germs of malaria do not live in the marsh; it is carriers of the germs which live there. The anophelines themselves are the malarial miasma.

অর্থাৎ জলাভূমি হইতে উত্থিত ম্যায়স্মাই ম্যালেরিয়ার কারণ, (ম্যায়স্মা শব্দের অর্থ বায়ুতে ভাসমান সংক্রামক বিষ); কিন্তু এই ম্যায়স্মা, গ্যাস বা বাষ্প বিশেষ নহে—ইহা জীবন্ত কীটাণু। এই ম্যালেরিয়া-বীজ জলা-ভূমিতে অবস্থিতি করে না, তাহাদিগের বাহকসমূহই এই স্থানে বাস করে। এনোফেলিস মশককুলই যে ম্যালেরিয়া বিষের মূলস্বরূপ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ম্যালেরিয়া জ্বর পাঁচ প্রকার।

ইণ্টারমিটেণ্ট, এগু (Ague) বা সবিরাম জ্বর।—ম্যালেরিয়া-বিষ দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার তিন সপ্তাহ মধ্যে জ্বর উৎপন্ন করিয়া থাকে; কিন্তু বিষ প্রবল হইলে এক বা দুই দিনের মধ্যে জ্বর আক্রমণ করিতে পারে, ব্যক্তিবিশেষের দৈহিক অবস্থার তারতম্য অনুসারে পূর্ব্বরূপের বা প্রচ্ছন্ন অবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে; এই সময়ে অস্বচ্ছন্দতা অবসাদ, কোন কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছা, শ্রান্তি-বোধ, ক্ষুধামান্দ্য ও শিরঃপীড়া উপস্থিত হয় তৎপরে শৈত্যাবস্থায় পরিণত হয়। আক্রান্ত ব্যক্তি প্রথমে হস্ত পদাদিতে, পরে সমস্ত শরীরে অত্যন্ত শীতবোধ করে ও কাঁপিতে থাকে, শরীর বিবর্ণ হয়, এবং এই সময়ে দেহের বাহ্যিক উত্তাপ বৃদ্ধি অনুভূত না হইলেও গুহ্য-দেশে থার্ম্মোমিটার দিলে ১০৫ বা ১০৬ ডিগ্রী উত্তাপ লক্ষিত হয়। কটিদেশ, মস্তক ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা অনুভূত হয়; ক্ষুধা কিছুই থাকে না, পিপাসা অত্যন্ত অধিক ও পেটভার, জিহ্বা ঠাণ্ডা ও ভিজা থাকে ও অঙ্গ বিবর্ণ হয়; এতদ্ব্যতীত অন্য কোন দোষ লক্ষিত হয় না; বমনেচ্ছা হয় অথবা বমি হয়, শ্বাস প্রশ্বাস অতি দ্রুত চলিতে থাকে, নাড়ীর গতি দ্রুত কঠিন ও বিষম হইয়া থাকে; এ অবস্থা দশ বা পনর মিনিট হইতে এক ঘণ্টাকাল।

IMPERIAL

উত্তপ্ত অবস্থা—এখন কম্প কমিয়া আসে, কিন্তু গাত্রের উত্তাপ ১০২ হইতে ৪ ডিগ্রী হয়। ত্বক ঈষৎ রক্তাভ, মুখমণ্ডল ও চক্ষু লাল হইয়া থাকে; পিপাসা অত্যন্ত বৃদ্ধি, মুখ শুষ্ক ও জিহ্বা শ্বেতবর্ণ হয়, ক্ষুধা থাকে না, বমনেচ্ছা হয় বা বমি হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের বেগ পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া আসে; হৃৎপিণ্ড ও প্রধান প্রধান ধমনীসমূহ ধড়্ কড়্ করে; বার বার মূত্রত্যাগেচ্ছা হয়, নাড়ী কঠিন, পূর্ণ ও তার বলিয়া বোধ হয়, মস্তকে বেদনা থাকে, দপ্ দপ্ করে। কেহ কেহ ভুল বকিয়া থাকে, এ অবস্থা অর্দ্ধ হইতে তিন বা চারি ঘণ্টাকাল।

ঘর্ম্মাবস্থা—প্রথমে কপালে তৎপরে সর্ব্বশরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হয়; কোন কোন রোগী এত ঘামে যে বিছানা পর্য্যন্ত ভিজিয়া যায় এবং এক প্রকার দুর্গন্ধ (জ্বোরো গন্ধ) বহির্গত হয়। জ্বর ক্রমশঃ ত্যাগ হইতে থাকে, পূর্ব্বোক্ত উপদ্রব সমূহ থাকে না, রোগী সুস্থ বোধ করে এবং নিদ্রা যায়; কেহ কেহ এসময়ে অধিক পরিমাণে তরল মল মূত্র ত্যাগ করে।

বিরাম অবস্থা—অর্থাৎ একবার জ্বর ত্যাগের পর পুণরাক্রমণের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত জ্বরমুক্ত অবস্থাকে বিরাম অবস্থা কহে। প্রথম জ্বর ত্যাগের পর শরীর বেশ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ বোধ হয়, ক্ষুধা-নিদ্রা-বল প্রায় পূর্ব্বের ন্যায়ই থাকে; কিন্তু পুনরাক্রমণের পর শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল, বিবর্ণ, ও রক্তহীন হয়, যকৃৎ ও প্লীহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে; নানারূপ বেদনা, অবসাদ ও অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয়।

সবিরাম জ্বরের প্রকার ভেদ—

(১) **কোটীডিয়েন** (Quotidian) অন্যেদ্যুক জ্বর। অহোরাত্রে একবার জ্বর আক্রমণ করে, মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই প্রায় আসিতে দেখা যায়; শৈত্য অবস্থা অল্পক্ষণ কিন্তু উত্তপ্ত অবস্থা অধিককাল স্থায়ী হয়। কখন কখন এক অহোরাত্রের মধ্যে দুইবার জ্বর আক্রমণ করিতে দেখা যায়; ইহাকে **দ্বৈকালিক** Double Quotidian জ্বর কহে।

২ **টার্ষিয়ান** Tertain বা তৃতীয়ক জ্বর, এক দিন অন্তর জ্বর আসে, আক্রমণের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। আর এক প্রকার জ্বর প্রত্যহ হইতে দেখা যায়, ইহাতে প্রথম দিনের জ্বরের সহিত তৃতীয় দিনের এবং দ্বিতীয় দিনের জ্বরের সহিত চতুর্থ দিনের জ্বরের সৌসাদৃশ্য থাকে; অর্থাৎ যদি কাহারও সোমবারে বেলা এগারটার সময় প্রথম জ্বর হয় এবং যতক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, বুধবারে ঠিক ঐ সময়ে জ্বর আসে এবং ঐ প্রকারই জ্বরভোগকাল হয় এবং বৃহস্পতিবারের জ্বর মঙ্গলবারের জ্বরের ন্যায় হইয়া থাকে। কোন কোন তৃতীয়ক জ্বরে প্রথম দিনে দুইবার এবং তৃতীয় দিনে দুইবার জ্বর হয়, মধ্য দিনে জ্বর হয় না এবং রোগী বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, এই দুই প্রকার জ্বরকে দ্বিত্র্যহিক Double Tertain কহে।

(৩) **কোয়ার্টান** (Quarrtan) বা চাতুর্থক জ্বর, প্রত্যেক তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ দুই দিন অন্তর জ্বর আক্রমণ করে, ইহা কদাচিৎ দেখা যায়।

২। রেমিটেণ্ট ফিভার। (Remittent fever) **স্বল্পবিরাম বা সন্তত জ্বর।**—এই জ্বর প্রায় সমস্ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বৃদ্ধি বা হ্রাস অনিয়মিতরূপে হইয়া থাকে, বিরাম অল্প ও প্রাবল্য অধিককাল স্থায়ী হয়; জ্বর প্রবল হইলে বিরাম অবস্থা প্রায় বুঝিতে পারা যায় না। জ্বর প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্বে উপর পেটে বেদনা, অবসাদ, অসুস্থতা ইত্যাদি অনুভূত হয়। কাহার কাহার সর্দ্দি হয়, তৎপরে শীতবোধ হয় এবং কম্প আসে। এই শৈত্য অবস্থা অল্পক্ষণ থাকিয়া উত্তপ্ত অবস্থায় পরিণত হয়; শীঘ্র দৈহিক উত্তাপের বৃদ্ধি হয়। মুখমণ্ডল ও চক্ষু ঈষৎ রক্তাভ হয়, দেহের জড়তা, অস্থিরতা, অনিদ্রা, বমনেচ্ছা, প্রলাপ, শিরঃপীড়া ইত্যাদি উপসর্গ লক্ষিত হয়। রোগী প্রথমে ভুক্তদ্রব্য সমূহ, তৎপরে জলবৎ এবং সর্ব্বশেষে পিত্তাদি বমন করে। যে সকল রোগীর কৃষ্ণ বা ধূসরবর্ণের বমি হয়, তাহাদিগের এই জ্বর বিপজ্জনক। পিপাসা অধিক হয়, জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয় শুকাইতে থাকে, জিহ্বা খরস্পর্শ (কাঁটা কাঁটা বলিয়া বোধ) হয় এবং পেটভার থাকে। নাড়ীর গতি দ্রুত হয়, কোন কোন স্থলে প্রবল বেগবিশিষ্ট বা ক্ষীণ হয়। দৈহিক উত্তাপ ১০৫ বা ৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই সকল লক্ষণ প্রায় ছয়ঘণ্টা হইতে বারঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিয়া কমিয়া যায়; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে এক, দুই, তিন বা অধিক দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। অল্প ঘাম হইলে বুঝিতে পারা যায় যে, জ্বর ক্রমশঃ লঘু হইয়া আসিতেছে। বিরাম অবস্থা অত্যল্পক্ষণ, সঙ্গে সঙ্গে পুনরাক্রমণ হয় এবং পূর্ব্ব লক্ষণ সমূহ অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রায়ই প্রাতঃকালে একটু জ্বরের বিরাম দেখা যায়, মধ্যাহ্নে পুনঃ প্রকোপ হয় এবং অর্দ্ধ রাত্রি হইতে জ্বর কমিতে থাকে; কোন কোন স্থলে মধ্যরাত্রে জ্বর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। প্রবল জ্বরে দুইবার (মধ্যাহ্নে ও মধ্যরাত্রে) প্রকোপ অনুভূত হয়। যকৃৎ, প্লীহা বেদনাযুক্ত ও বর্দ্ধিত হয়, এই জ্বর কিছুকাল স্থায়ী হইলে চক্ষু ও ত্বক হরিদ্রাবর্ণ হয়, ইহার ভোগ কাল পাঁচদিন হইতে প্রায় চৌদ্দদিন পর্য্যন্ত। ইহার পরিণাম—(১) সচরাচর অধিক ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর ত্যাগ হয়, কোনও কোনও স্থলে অল্প ঘর্ম্ম হইয়া ক্রমশঃ জ্বর ত্যাগ হয়, (২) অধিকাংশ স্থলে পুরাতন জ্বরে পরিণত হয়, (৩) অত্যধিক দুর্ব্বল ও রক্ত বিষাক্ত হইয়া কতিপয় রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

৩। পার্নিসস (Pernicious) বা **ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বর।**—এই প্রকার জ্বর অতিশয় ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দেশে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক। প্রথমে সামান্য জ্বর হইতে থাকে ও মধ্যে মধ্যে কোন কোন দিন প্রবল জ্বর হয়। প্রত্যেক পক্ষে, মাসে কিম্বা ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় জ্বর হইয়া থাকে এবং ইহার শৈত্য, উত্তাপাদি অবস্থা ভালরূপে বুঝিতে পারা যায় না; কোনও কোনও স্থলে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। এই জ্বর কখন কখন আক্রমণের প্রথম হইতে হয়।

ইহার প্রকার ভেদ—

(১) নার্ভাস (Nervous) বা

স্নায়বিক—এই জ্বর স্নায়ুমণ্ডলীর উপর বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে, এবং এ দেশে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী অত্যন্ত ভুল বকে, গাত্র ঘর্ম্মহীন, শুষ্কবৎ এবং অধিক উত্তপ্ত হয়, কখন কখন আক্ষেপ, ধনুষ্টঙ্কার ইত্যাদি উপদ্রব দৃষ্ট হয়; রোগী হঠাৎ পড়িয়া যাইতে পারে এবং সাধারণতঃ অজ্ঞান হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় বার ঘণ্টা হইতে চব্বিশ ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত থাকিতে পারে; যদি প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম ও তৎসঙ্গে চৈতন্যলাভ হয়, তাহা হইলে জীবনের আশা করিতে পারা যায়, কিন্তু পুনরাক্রমণে সে আশা থাকে না।

অ্যাল্‌জিড্ (Algid)—এই জ্বরে পাকাশয় ও অন্ত্র সমূহের অর্থাৎ পেটের দোষ ঘটিয়া থাকে; প্রথম হইতে বমি, পেটে বেদনা, তরল মলভেদ, কখন কখন আমাশয় রোগ হয়। অত্যধিক দুর্ব্বলতাবশতঃ রোগী শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। এই জ্বরে রোগী অত্যন্ত শীতবোধ করে এবং গাত্রের উত্তাপ স্বাভাবিক বা তদপেক্ষা, হ্রাস হয়; কিন্তু মলাশয়ের উত্তাপাধিক্য হয়, নাড়ী ক্ষীণ ও সামান্যরূপ অনুভূত হয়; শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয়; মূত্র অল্প পরিমাণে হয় অথবা বন্ধ হইয়া যায়; এরূপ অবস্থা কতিপয় দিন পর্য্যন্ত থাকে; এ সময় জ্বর বৃদ্ধি হয়; কখন কখন কামলা (ন্যাবা) অর্থাৎ চক্ষু ও ত্বক্ হরিদ্রাবর্ণ হয়, উদরাময় ও বায়ুবিকার প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়, অবশেষে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

(৩) হিমোরেজিক (Hæmorrhagic)—এ প্রকার জ্বরে নাসা ও মলদ্বার হইতে, এবং প্রস্রাবের সহিত রক্ত নির্গত হয়, এমন কি কোন কোন রোগীর লোমকূপ দিয়া রক্তস্রাব হইতে দেখা যায়, এ পীড়া সাঙ্ঘাতিক। হিমোগ্লোবিনিউরিক (Hœmoglobinuric Fever) কিম্বা ব্লাক ওয়াটার (Black watet Feves জ্বর বা কালা জ্বর অস্মদ্দেশে আসাম, টেরাই প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ জ্বরের ন্যায় ইহার আক্রমণ, দৈহিক উত্তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; সঙ্গে সঙ্গে কম্প আসে এবং বমির সহিত পিত্ত নির্গত হয় ও পিত্তমিশ্রিত তরল মলভেদ হয়, বারম্বার মূত্র ত্যাগেচ্ছা হয় এবং তাহা কৃষ্ণ রক্তাভ হয়, এবং মূত্রযন্ত্রের প্রদাহ বশতঃ কোমরে বেদনা হয়। যকৃৎ ও প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, এবং চক্ষু ও ত্বক্ অল্প হরিদ্রাভ হয়। জ্বরত্যাগ হইলে এ সকল লক্ষণ দেখা যায় না, কিন্তু পুনরাক্রমণে আবার দেখা যায়। এই দুঃসাধ্য রোগে মূত্রাবরোধ, আক্ষেপ অথবা সংজ্ঞানাশ হইলে রোগী প্রাণত্যাগ করে।

৪। মাস্ক্‌ড্ ইণ্টারমিটেণ্ট Masked Intermittent —এই প্রকার জ্বর অতি প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান থাকে, জ্বর বুঝিতে পারা যায় না, তৎপরিবর্ত্তে অন্য লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হয়। ইহা অধিককাল স্থায়ী ম্যালেরিয়া রোগ হইতে উৎপন্ন হয়; রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সময়ে সময়ে অস্বচ্ছন্দতা ও স্থানে স্থানে বাতিক বেদনা অনুভব করে, বিশেষতঃ চক্ষুর উপরিভাগে ও জঙ্ঘাদেশে S§iatica চর্ম্মরোগে বিশেষতঃ হার্পীজ Herpes রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। উদরাময় প্রভৃতি শ্বাসরোগে, দৃষ্টিশক্তির দোষ অথবা দৃষ্টিলোপ' শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ, মধ্যে মধ্যে রক্ত

নির্গমন, পক্ষাঘাত, আক্ষেপাদি উপসর্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

৩। **ম্যালেরিয়েল ক্যাকেকৃসিয়া** (Malarial Cachexia)—অধিক দিন পুনঃ পুনঃ সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বরে ভুগিলে ম্যালেরিয়েল ক্যাকেকৃসিয়াতে পরিণত হয়; সুতরাং ইহা পুরাতন রোগের এক প্রকার অবস্থান্তর মাত্র, ও অত্যন্ত ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত দেশে দেখা যায়; ইহার প্রধান লক্ষণ রক্তহীনতা, ত্বকের কৃষ্ণ হরিদ্রাভ বর্ণ (হলীমক), প্লীহার কাঠিন্য ও সঙ্গে সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে বড় হয় এবং রক্তহীনতাবশতঃ পদদ্বয়ের গাঁইট ছইটী ফুলিয়া থাকে এবং সচরাচর অনিয়মিত রূপে জ্বর হইতে দেখা যায়।

ম্যালেরিয়া জ্বরে অন্যান্য দৈহিক পরিবর্ত্তন—

(১) **রক্ত**।—ম্যালেরিয়া জীবাণু কর্তৃক রক্ত শীঘ্র দুষিত হইয়া থাকে, অথবা বহুদিন এই জ্বর ভোগ করিলে রক্ত দুষিত হয়। এ অবস্থায় রক্তে জলীয় পদার্থ অধিক, রক্তের লালকণিকা নষ্ট, এবং বর্ণ্যদ্রব্য (Pigment) প্রস্তুত হওয়ায় রক্তহীনতা বা পাণ্ডুরোগ (Anæmia) উৎপন্ন হয় এবং ক্রমশঃ অত্যধিক রক্তহীন হইলে তৎসঙ্গে কামলা রোগ (Jaundice) বা ন্যাবা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন যন্ত্রের কৈশিক শিরাসমুহ এই সকল জীবাণু দ্বারা পরিব্যাপ্ত ও আবদ্ধ হয়। শরীরে নানাস্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে পারে, তাহা প্রায় সাংঘাতিক হয়।

(২) **প্লীহা**।—ইহা সচরাচর বা গুরুতরভাবে আক্রান্ত হয়, জ্বরের প্রথম অবস্থায় সামান্য বা বিশেষরূপে বড় হইতে দেখা যায়। সবিরাম জ্বরে, জ্বরত্যাগ কালে, ইহার আয়তন কমিয়া যায়, কিন্তু পুনরাক্রমণে আবার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যখন প্লীহার অভিবৃদ্ধি হয়, তখন আকারে বৃহৎ ও কোমল হয়, এইরূপ প্লীহা সামান্য আঘাতে ফাটিয়া যাইতে পারে। এই সুবৃহৎ প্লীহা নিয়মিতরূপ সুচিকিৎসায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু পুনঃ পুনঃ জ্বর আক্রমণে ও অধিককাল ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দেশে বাসহেতু ইহা চিরস্থায়ী ভাবে বৃহৎ ও কঠিন হইয়া যায়।

(৩) **যকৃত**।—প্লীহার সঙ্গে সঙ্গে যকৃত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাদৃশ নহে। সাধারণতঃ সবিরাম জ্বরে প্রথমে কোনরূপ যান্ত্রিক বৈলক্ষণ্য ঘটে না; কিন্তু পার্ণিফস্ জ্বরে সুবৃহৎ এবং পৈশিক শিরা সমুহ বর্ণ্যদ্রব্য সংযুক্ত রক্ত কোষ সমুহের দ্বারা পরিপুর্ণ হয়। পুরাতন রোগে যকৃৎ চিরস্থায়ী ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত, অত্যন্ত কঠিন ও বর্ণ্যদ্রব্য সংযুক্ত হয়, ইহার কারণ এই সকল বর্ণ্যদ্রব্য (pigment) প্রদাহ উপস্থিত করিয়া ইহাকে সঙ্কোচক পরিবর্ত্তনে (cirrhosis) আনয়ন করে।

(৪) **মূত্রযন্ত্র**।—মূত্রযন্ত্র দ্বয়ে অধিক পরিমাণে রক্ত সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং প্রবল রোগে ইহাদের কৈশিক শিরাসমূহের পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং পুরাতন রোগে ইহাদের আয়তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বর্ণ্যদ্রব্য যুক্ত হইয়া থাকে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা এই সকল বর্ণ্যদ্রব্য মুত্রযন্ত্রস্থ কোষ ও নল সমুহে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবল জ্বরে সচরাচর

মূত্রযন্ত্রের প্রদাহ হইয়া থাকে, কিন্তু সামান্য জ্বরে কদাচিৎ হয়। পার্ণিসস ম্যালেরিয়াতে যে রক্ত প্রস্রাব হয়, তাহা মুত্রযন্ত্র হইতে নির্গত হয়।

(৫) ফুস্‌ ফুস্‌।—শ্বাসনলীর সামান্য প্রদাহ হয়, সে কারণ সর্দ্দি, কাশ এই জ্বরের প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায়; চিকিৎসাবিশারদগণ বলিয়া থাকেন যে, নিউমোনিয়া নূতন ও পুরাতন ম্যালেরিয়ার সহিত প্রায়ই দেখা যায়, সে কারণ এই প্রকার নিউমোনিয়াকে ম্যালেরিয়া-দুষ্ট বলিয়া বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইহা ম্যালেরিয়ার উপসর্গ মাত্র, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দেশবাসী হঠাৎ শীতপ্রধান দেশে আসিলে প্রায়ই নিউমোনিয়া রোগাক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে অধিকাংশ বিষয় বর্ণিত হইল; এখন কোন্ কোন্ স্থানে এই রোগের প্রকোপ হইতে পারে, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে —(১) যে সকল জলাভূমি সর্ব্বদা জলে প্লাবিত থাকে না; (২) গ্রীষ্মপ্রধান দেশস্থ, তৃণ, গুল্ম, বৃক্ষাদি বহুল উপত্যকা, পর্ব্বতশ্রেণীর নিম্নদেশ সমূহ এবং নদীখাত ও যে সকল নদীতট বন্যায় নীত পলিমাটী ও বালুকারাশির দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে এবং কখনও কখনও বন্যায় প্লাবিত হয়, (৩) তৃণ পর্ণাদি সঙ্কুল ভূমি যাহা কখন কখন বন্যায় বা বৃষ্টির জলে ডুবিয়া যায় এবং জল নির্গত হইলেও আর্দ্র থাকে; (৪) যে স্থান দিয়া পুষ্করিণী বা হ্রদের জল বহির্গত হয়; (৫) জৈবপদার্থবিশিষ্ট বালুকাময় সমতল ভূমি যদি তাহার নিম্নে মৃত্তিকাস্তর থাকে (৬) যে সকল স্থান কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিবার নিমিত্ত বনজঙ্গলাদি ছেদন করিয়া উহা স্তূপীকৃত করা হয় ও পচিতে থাকে। (৭) যে স্থানে খাল (canal) কাটান হয় কিম্বা রেলওয়ের মাটীর কাজ হয়। (৮) গ্রীষ্মপ্রধান দেশস্থ বদ্বীপ সমূহ—যথা গঙ্গার বদ্বীপ (Gangetic Delta)।

গ্রীষ্মের অবসানে ও বর্ষার প্রারম্ভে এই রোগের প্রকোপ অনুভূত হয় এবং হেমন্তকাল পর্য্যন্ত পূর্ণভাবে বর্ত্তমান থাকে, (অর্থাৎ শ্রাবণ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত); শীতকালে ইহার প্রকোপ কমিয়া যায়। প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি ম্যালেরিয়া-বিষ দমনে সমর্থ, কারণ ইহা বিষ শোষণ করিয়া লয়; সে কারণ অতিরিক্ত বৃষ্টি কিম্বা প্রবল বন্যা হইলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেকাংশে কম হয়।

নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রতিপালন করিলে অনেকাংশে ম্যালেরিয়া হইতে রক্ষা পাওয়া যায়;—

১। **সর্ব্বাগ্রে মশক-দংশন হইতে শরীরকে রক্ষা করিবেন।** দেহ সর্ব্বদা বস্ত্রাচ্ছাদিত রাখা এবং রাত্রিকালে মশারি খাটাইয়া শয়ন কর্ত্তব্য। কৃষক ও কুলী মজুরগণকে (বিশেষতঃ মাঠে কার্য্য করিতে যাইবার পূর্ব্বে) বিশুদ্ধ সর্ষপ তৈল মাখিতে উপদেশ দিবেন। যেখানে এই প্রকার তৈলের অভাব, তথায় তার্পিন তৈল (এক তোলায় ত্রিশ ফোঁটা তার্পিন) সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে চলিতে পারে। কেরাসিন কিম্বা তার্পিনতৈল মশক

দষ্ট স্থানে কিয়ৎক্ষণ ঘর্ষণ করিলে ম্যালেরিয়া-বিষ নষ্ট হইতে পারে।

সম্প্রতি বোম্বাই নগরের মেডিকেল কংগ্রেস, ম্যালেরিয়া দমনার্থে এই মর্ম্মে উপদেশ দিয়াছেন (১) মশককুলের সংখ্যাহ্রাসকরণ; (২) মনুষ্যদেহস্থ জীবাণু কুইনাইন * সেবন দ্বারা ধ্বংসকরণ; (৩) অন্যান্য উপায় অবলম্বন, যথা সূক্ষ্মতার নির্ম্মিত জাল দ্বারা গৃহপথাদি আচ্ছাদন, রোগীকে পৃথক করণ, সাধারণ লোকের ম্যালেরিয়া বিষয়ক জ্ঞান ইত্যাদি। পয়ঃ প্রণালী দ্বারা আবদ্ধ জল সমূহ বহিষ্কৃত করিয়া দিলে, মশককুলের সংখ্যা অনেকাংশে কম হইতে পারে; কিন্তু ইহা ব্যয়সাধ্য, সে কারণ সহর অঞ্চলেই এ সকল ব্যবস্থা চলিতে পারে; গ্রাম্যলোকদিগের মধ্যে কুইনাইন বিতরণ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

২। রাত্রিকালে ম্যালেরিয়া বিষের প্রকোপ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এই সময় গৃহ হইতে বহির্গমন ও অনাবৃত অবস্থায় থাকা উচিত নয় এবং লঘু ও সুপাচ্য আহার কর্ত্তব্য। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে, বর্ষা শেষে, শরৎ ও হেমন্ত কালে সন্ধ্যার পর হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ভূমির দশ বা বার ফিট ঊর্দ্ধদেশ, কুয়াসার ন্যায় এক প্রকার বাষ্প দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, এবং ইহা চন্দ্রালোকে সুন্দররূপে দৃষ্টিগোচর হয়; ইহা ম্যালেরিয়া বিষপূর্ণ বাষ্পরাশি। এই বাষ্পরাশি অধিক উর্দ্ধে প্রসারিত হইতে পারে না এবং বায়ু কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্য দিয়া গমন কালে নাসাপথ দ্বারা শরীরের মধ্যে বিষ প্রবেশ করিতে পারে; সুতরাং এই সময় নাসিকা ও মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া গমনাগমন কর্ত্তব্য। দ্বিতল গৃহে শয়ন করিলে ম্যালেরিয়া বিষপূর্ণ বাষ্প হইতে অনেকাংশে রক্ষা করা যাইতে পারে।

৩। পানীয় জলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। ম্যালেরিয়া প্রকোপ কালে পরিস্রুত জল ব্যবহার একান্ত আবশ্যক। অতি সহজ উপায়ে জল পরিস্রুত করা যাইতে পারে, যথা—কলসী বা হাঁড়ি কিঞ্চিৎ ব্যবধানে রাখিয়া উপর উপর সংরক্ষিত করিতে হয়; সর্ব্বোপরি পাত্রে তৃতীয়চতুর্থাংশ কাষ্ঠের কয়লা দ্বারা পূর্ণ ও তন্নিম্ন পাত্র ঐ রূপে বালি দ্বারাপূর্ণ করিতে হয় এবং সর্ব্বনিম্ন পাত্রের মুখকাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত রাখিতে হয়, প্রথম দুইটী পাত্রের নিম্নে সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকিবে। প্রথমে কয়লার পাত্রে স্ফুটিত গরম জল ঢালিয়া দিবেন, ঐ জল ক্রমশঃ চোঁয়াইয়া বালির পাত্রে পড়িবে, এবং তাহা হইতে, তৃতীয় পাত্রে সঞ্চিত হইয়া থাকিবে; এই তৃতীয় পাত্রের জলই পরিস্রুত জল, ইহা নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ। কলেরার প্রকোপ কালে এই প্রকার জল ব্যবহার করা উচিত। যাঁহারা এইরূপ কার্য্যে আয়াস বোধ করেন, তাঁহারা স্ফুটিত গরম জল মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবেন; এই জল বার ঘণ্টা

---

* আয়ুর্ব্বেদের মতে কিন্তু কুইনাইন অপেক্ষা হরিতাল ঘটিত ঔষধ কম নহে, এজন্য এরূপ অবস্থায় আমরা হরিতাল ঘটিত ঔষধ ব্যবহারেরই পরামর্শ দিতেছি।

—আঃ সং

কাল ব্যবহার করা যাইতে পারে, ইহার পর দূষিত হয়। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ একটী ফিল্টার দ্বারা অনায়াসেই এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন।

স্রোতস্বতী নদীতে, পরিষ্কার জলে অথবা গরম জল শীতল করিয়া স্নান করা উচিত; যে স্থানে বিশুদ্ধ জলের অভাব, গৃহস্থ মাত্রেই কূপ খনন করাইয়া তাহার জলে স্নান পান ও রন্ধন ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন; কারণ ইহার জল বাহিরের সংক্রামক দোষ হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

কূপখনন ও স্থান নির্ব্বাচন সম্বন্ধে উপদেশ।—(১) সমতল স্থান অপেক্ষা একটু উচ্চস্থান; (২) পাইখানা বা নর্দ্দমা নিকটে না থাকে; (৩) বৃক্ষাদির তলদেশে না হয়। প্রত্যেক কূপ দোহারা পাটের (অর্থাৎ বড় পাটের মধ্যে ছোট পাট বসাইয়া) নির্ম্মাণ করা উচিত; এবং এই দুই পাটের ব্যবধান, কেবল মাটী দিয়া ভরাট না করিয়া খুটিঙ ও বালি মিশ্রিত করিয়া ভরাট করিলে জল অতি নির্ম্মল হয়।

অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ, পুষ্করিণী বা দীঘি খনন বা সংস্কার করাইবেন এবং ইহার জল কোন প্রকারে দূষিত না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। ইহার চতুষ্পার্শ্ব এরূপ ভাবে সুরক্ষিত করা আবশ্যক—যেন বাহিরের ময়লা জল প্রবেশ করিতে না পারে। সন্নিকটস্থ বৃক্ষাদি ছেদন করা উচিত, কারণ ইহাদের পত্রাদি জলে পড়িয়া পচিতে পারে; নচেৎ পুষ্করিণী জাল দ্বারা আচ্ছাদিত করিবেন। প্রত্যেক গ্রামে, অন্ততঃ একটী স্বতন্ত্র পুষ্করিণী পানীয় জলের নিমিত্ত রাখা কর্ত্তব্য, তাহাতে স্নান, কাপড় ধৌতকরণ ইত্যাদি উচিত নহে কেবল জল তুলিয়া ব্যবহার করা হইবে।

৪। পল্লীগ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থের খিড়কীতে প্রায়ই একটী পচা পুকুর বা ডোবা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই গুলির সংস্কার বা ভরাট করা একান্ত কর্ত্তব্য; কারণ সেই সকলই ম্যালেরিয়া উৎপত্তির প্রধান স্থান; যাঁহারা এই সকল ভরাট করিতে স্বার্থের হানি বিবেচনা করেন, তাঁহারা ইহাতে অধিক পরিমাণে উরুল ("তে-চোখো" বা "পাঁচ-চোখো") এবং চেলামাছ জন্মাইতে পারে—তাহার বন্দোবস্ত করিবেন।

Bengal Fisheries,—Commissioner's Report—These fish (three-eyed or five-eyed) cat up the larvœ both of culex and anopheles mosqitoes with great avidity and if proper attention b: giveh to them they may serve the same purpose here for both cul·x and anopheles &.....................

সরকারী মৎস্য বিভাগীয় কমিসনারের মন্তব্য :—এই সকল (তেচোখো ও পাঁচ-চোখো) মৎস্য এনোফিলিস ও কিউলেক্স জাতীয় মশক সমূহের সদ্যঃ প্রসূত দিগকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করে, এবং যদ্যপি ইহাদিগের বংশবৃদ্ধি সম্বন্ধে একটু মনোযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে অনেকাংশে ম্যালেরিয়া-বাহক মশকদিগের সংখ্যা হ্রাস করা যাইতে পারে।

৫। গ্রাম ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বৃষ্টি কিম্বা বন্যার জল শীঘ্র বহির্গত হইয়া যায়

তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবেন, এই জল অবরুদ্ধ থাকিলে ম্যালেরিয়া প্রকোপের সহায়তা করে। জলা ভূমি এবং যে সকল স্থানের জল বহি করণের উপায় না থাকে, সেই জলে কেরোসিন তৈল নিক্ষেপ করিয়া ম্যালেরিয়া-বীজ ধ্বংস করিতে সক্ষম হইবেন, কিন্তু সাবধান থাকিবেন—যেন কোন গৃহপালিত পশ্বাদি ইহা পান করিতে না পারে।

৬। গৃহাদি সমতল অপেক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে উচ্চস্থানে নির্ম্মাণ করিতে পারিলে ভাল হয়; এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি শুষ্ক থাকে বা জল দাঁড়াইতে না পারে—এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিবেন। গৃহ মধ্যে রীতিমত আলোক ও বায়ু আগমনের পথ রাখিবেন।

৭। শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম প্রত্যহ করা উচিত, বলিষ্ঠ ব্যক্তিগণ শীঘ্র ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় না।

৮। যাঁহারা ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দেশে নূতন আগমন করেন, স্থানীয় লোক অপেক্ষা তাঁহাদিগের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত,কারণ স্থানীয় লোকদিগের জল বায়ু এক প্রকার সহ্য আছে, আগন্তুক ব্যক্তিগণ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইলে বিশেষরূপে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ভুগিয়া থাকেন।

কালাজ্বর।

[কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ]

—:o:—

পূর্ব্বে Malariaর তুল্য লক্ষণ বিশিষ্ট এবং ইহারই অবস্থান্তরভেদে যে জ্বর Malarial cachexia বলিয়া অভিহিত হইত ও যাহাতে উপযুক্ত মাত্রায় কুইনাইন প্রয়োগ করিয়াও কোন ফল না পাওয়ায় তাৎকালীন যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, সূর্য্যকুমার ঘোষ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ডাক্তারগণ নিজেদের দেশীয় ঔষধের প্রতি কোন লক্ষ্য না করিয়া অধিক মাত্রায় কুইনাইন প্রয়োগের উপদেশ দিতেন, —সেই জ্বর আজ আবার Malaria হইতে পৃথক রোগ বলিয়া দেশের প্রধান প্রধান-ডাক্তারগণ কর্তৃক অভিহিত হইতেছে। এখন তাঁহাদের মতে ইহা Malaria হইতে একটী স্বতন্ত্র ব্যাধি। Malaria রোগে যে জাতীয় বীজাণু রক্তে পরিদৃষ্ট হয়, এই জ্বরে তজ্জাতীয় বীজাণু দেখা যায় না। ইহার বীজাণু স্বতন্ত্র এবং তাহাকে Laishman Donovan bodies বলে। কুইনাইন এই সকল Parasitesএর উপর কোন কার্য্য করে না। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথম হইতেই এই জ্বর উৎপন্ন হয়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে Malariaর পুরাতন অবস্থায় ঐ বীজাণুগুলি শরীরের

ভিতর প্রবেশ করিয়া বংশ বিস্তার করে; তখন Malariaর বীজাণুগুলি নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া সেই Malaria এই জ্বরে পরিণত হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, Malaria এবং কালাজ্বরের উভয় জাতীয় বীজাণুই একত্র (side by side) অবস্থান করে।

এই জ্বরকে তাঁহারা Black Fever কহেন। Black Fever কথাটী বাংলা "কালাজ্বরের" ইংরাজী অনুবাদ।

"কালাজ্বর" কথাটী উর্দ্দু—কালা (deadly) এবং আজর্ (পীড়া) হইতে উৎপন্ন; কিম্বা এই রোগে রোগীর বর্ণ কাল হয় বলিয়া কালা (Black) এবং আজর্ (পীড়া) কহে Leishman সাহেব এই রোগ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া ইহার অপর নাম 'Leishmaniasis'

এই রোগের চিকিৎসায় এ কাল পর্য্যন্ত ডাক্তারেরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেন না। কারণ কুইনাইন এ ক্ষেত্রে কোনই কার্য্য করে না। তাঁহারা কুইনাইন খাওয়াইয়া খাওয়াইয়া রোগীর শেষ করিয়া ছাড়িতেন।

পাশ্চাত্য দেশে Antimony লইয়া যে পরীক্ষা চলিতেছিল, তাহার ফলে রুসিয়ার Martin & Laboeuf ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে Try panosomiasis রোগে Tartar Emetic প্রয়োগ (Intravenous) করিয়াছিলেন। Vianna and Machado ১৯১৩ খ্রীঃ অব্দে ইটালীদেশে 'American Muco cutaneous Leishmaniasis' রোগে Antimony প্রয়োগ করেন। ১৯১৫ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে caronia and Dicristina ইটালীতে Infantile Kala Azar এ ইহার Injection প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন এবং সেই সংবাদ অবগত হইয়া জুলাই মাসে Sir Leonard Rodgers কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে, অক্টোবর মাসে কলিকাতার School of Tropical Medi ine এ E. Muir এবং ১৯২০ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে শিলংস্থিত Pasteur Instituteএ Knowles কর্ত্তৃক কালাজ্বরের রোগীর উপর এই ঔষধের Intravenous Injection পরীক্ষিত হয়। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত পরম্পরাক্রমে এই Injection চলিয়া আসিতেছে।

ডাক্তারগণ বলেন যে, কালাজ্বরে রোগীর অঙ্গুলির রক্ত পরীক্ষা করিলে রোগ অনেক সময় সম্যক্ নির্দ্ধারিত হয় না। প্লীহা কিম্বা যকৃৎ Puncture করিয়া রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিতে হয়। কিন্তু প্লীহা বিদ্ধ করিয়া রক্ত পরীক্ষা অতি বিপজ্জনক এবং অনেক সময় চিকিৎসারম্ভের পূর্ব্বেই পরীক্ষার মহিমাতেই রোগী প্রাণত্যাগ করে।

বর্ত্তমানে ইহাই যখন স্থির সিদ্ধান্ত, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী ডাক্তারগণ কি জন্য এই রোগকে Malarial cachexia বলিতেন এবং কেনই বা ইহাতে অত্যধিক মাত্রায় কুইনাইন প্রয়োগ করা উচিত—এবম্প্রকার উপদেশ দিতেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন; এখন আবার তাঁহারাই বলিতেছেন,—Antimony salts এর Injection ভিন্ন আরোগ্য হয় না। আবার কিছুকাল পরে তাঁহারা কোন্ তথ্য আবিষ্কার করিবেন তাহা ভগবান্ জানেন।

তখনকার দিনের ডাক্তারগণ যেমন আয়ুর্ব্বেদের মুণ্ড চর্ব্বণ করিতে করিতে এই রোগে

কুইনাইনকে সারাৎসার ও পরাৎপর বলিয়া প্রচার করিতেন, এখনকার দিনের ডাক্তারগণ আবার Antimony Injectionকে ঠিক সেই রকম মনে করিতেছেন।

Dr. Rodgers কিম্বা Dr. Muir—ইঁহাদের কথা ধরিনা, কারণ যদিও তাঁহারা এদেশে চিকিৎসা কার্য্য করিতেছেন, তথাপি তাঁহারা বিদেশী, নিজেদের চিকিৎসা বিজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া এ দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র—আয়ুর্ব্বেদের ঔষধ সমূহ যে পরীক্ষা করিবেন, ইহা কখনও আশা করা যায় না। কিন্তু এ দেশীয় লোক যাঁহারা চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিজেদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ সকলের সুফলতা উপলব্ধির করিবার চেষ্টা না পাওয়া বড়ই পরিতাপের বিষয়। আমরা তাঁহাদের নিকট এরূপ আশা করিতে পারি। মাইকেলের ভাষায় আমরা তাঁহাদিগকে বলি—

"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি ?"

কিন্তু তাঁহারা কি ইহা করিবেন ?

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ডাক্তারগণ পাশ্চাত্যভাবেই মজগুল্। যদিও ইঁহাদের মধ্যে ২।১ জন আয়ুর্ব্বেদে প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তথাপি বাল্যকাল হইতে আধুনিক শিক্ষা প্রভাবে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রয়োগ করিতে সাহসী হন না। তাঁহাদের পাশ্চাত্য প্রীতি এত অধিক যে, তাঁহারা দেশীয় পথ্য পর্য্যন্ত রোগীকে ব্যবস্থা করিতে চাহেন না। দেশনায়ক, খোদার বান্দা মহম্মদ আলী একবার প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন যে, বৎসরে প্রায় ৩৫ কোটি টাকার যে বিদেশী ঔষধ ও পথ্য এদেশে আমদানী হয়, প্রধান প্রধান ডাক্তার গণ হইতে সাধারণ কম্পাউণ্ডার পর্য্যন্ত সকলেই তাহার দালাল। তাঁহারা নিজেদের লক্ষ্মী, এই ভাবে পায়ে ঠেলিতেছেন, কিন্তু ইহার যে পরিণাম কি—একবারও ভাবিয়া দেখেন না। তাঁহাদের এমনই পাশ্চাত্য-প্রীতি যে মায়ের সুরক্ষিত অন্ন আপেক্ষা পাশ্চাত্যের উচ্ছিষ্টে অধিকতর আশক্তি।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শিক্ষার প্রচলন হয়। কিন্তু কই আজ পর্য্যন্ত এমন কোন চিকিৎসকের আবির্ভাব হইল না—যিনি চিকিৎসা, জগতে কোন নূতন তথ্য প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য কেবল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিদ্যা ধার করা এবং আয়ুর্ব্বেদের কুৎসা রটান। আজকাল কালাজ্বরে তাঁহারা যে Antimony Salts এর Intravenons Injection দিতেছেন, তাহা বড়ই বিপজ্জনক। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটী স্থল দেখান যাইতেছে।

১। Antimonyর Intravenons Injection দেওয়া কালে যদি কোনও কারণে ঔষধ একটুও শিরার বাহিরে লাগে, তবে সেই স্থান পাকিয়া পূঁয় ও ক্লেদ উৎপন্ন হয় এবং রোগী অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করে। শিরায় বায়ু প্রবেশ করিলে আরও বিপদ, তাহাতে হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যুরই সমধিক সম্ভাবনা। সাধারণতঃ ডাক্তার বাবুদের অসতর্কতার জন্যই উক্ত বিপদ ঘটিয়া থাকে এবং অস্থির প্রকৃতির লোক বিশেষতঃ চঞ্চল বালকবালিকার শরীরে ইহা প্রয়োগ করা একপ্রকার অসম্ভব।

২। রক্ত তাহার স্বাভাবিক গতি লইয়া চলিতেছে। এরূপ অবস্থায় সম্পূর্ণ অপ্রাকৃতিক পদ্ধতিতে অধিক পরিমাণে দ্রব পদার্থ শিরার ভিতর প্রবেশ করাইলে রক্তের গতি এবং স্বভাব ব্যাহত হয়। সুতরাং Injectionএর ফলে শরীরে যে ঝাঁকানি লাগে, তাহাতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ স্থলেই কাসিতে কাসিতে রোগীর দম বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হয়, চক্ষু লোহিত বর্ণ ধারণ করে এবং রোগী বমন করিতে আরম্ভ করে। এই সকল কারণে গর্ভিণী ও কোমল প্রকৃতি লোকের শরীরে Injection দেওয়া চলে না।

৩। কালা জ্বরে অত্যন্ত রক্তহীনতা উপস্থিত হয়। সেই জন্য রক্ত সঞ্চালনী যন্ত্র সমূহ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। Antimony Salfsএর স্বভাব এই ইহা Blood Pressure কমাইয়া দেয়, সুতরাং যেখানে Blood Pressure কমিয়া আইসে, সে স্থলে ইহা প্রয়োগে বিশেষ অপকার সাধিত হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ইহার Injection লইতে থাকিলে Fatty Degeneration of the Heart হইয়া থাকে।

৪। ইহা ফুস্‌ফুস্, শ্বাসনলী এবং পাকস্থলীর উগ্রতাসাধক (Irrifant) বলিয়া যেখানে কালাজ্বরের উপদ্রবরূপে Pneumonia, Bronchitis, Broncho Pneumonia, আম অতীসার (Dysentry) এবং অতিসার বিদ্যমান থাকে, সে স্থলে ইহা প্রয়োগ করা চলে না।

৫। ইহার Injection লইলে রোগীর প্রথম প্রথম অত্যন্ত ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। সেই সময় যদি রোগী ক্ষুধার তাড়নায় যদৃচ্ছা আহার করে, তাহা হইলে প্রবল অতীসার আইসে।

৬। মাত্রা নির্দ্ধারণ ইহার আর একটা গুরুতর ব্যাপার। সামান্য মাত্রাধিক্য ঘটিলেই ইহার দ্বারা শারীরিক যন্ত্রগুলি অনাবশ্যক ভাবে উত্তেজিত হইয়া থাকে ও নানাপ্রকার উপসর্গ আনয়ন করে।

৭। Injection লইতে আরম্ভ করিলে কালাজ্বরের বীজাণুগুলিকে হীনবল করিয়া রক্ত হইতে সরাইয়া দেয় এবং বীজাণুগুলি তখন মজ্জা প্রভৃতি আভ্যন্তর ধাতু আশ্রয় করে। এই জন্য রোগী প্রথম প্রথম কতকটা সুস্থতা বোধ করে। কিন্তু পুনঃ পুনঃ Injection লইতে থাকিলে বীজাণুগুলি Injection-সাহ্য হইয়া উঠে। কিছুকাল পরে হেম্বস্তর সেবন জন্য কিম্বা কালপ্রভাবে লব্ধবল হইয়া পুনবায় রক্তাদি ধাতুকে আশ্রয় করিয়া প্রবলবেগে রোগের পুনরাক্রমণ আনয়ন করে। তখন Injection দ্বারা কোনও ফল পাওয়া যায় না।

৮। আজকাল অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দীর্ঘকাল কালাজ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া রোগীর বুকের প্রদাহ (Injlammation of Kidneys) উপস্থিত হয়। অনেকে বলেন ইহা Antmony Iujectionএর ফল। এই সকল কারণে এই Injection দুর্ব্বল এবং কোমল প্রকৃতি ভারতবাসীর পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। ডাক্তারগণ বলেন, Antimony Injection কালাজ্বরের বিশিষ্ট ঔষধ (Specifie), যদি তাহারই হয় তবে রোগীর আরোগ্য লাভ করিতে এত বিলম্ব

হয় কেন? ৩২টী Injectionএর কমে কোনই ফল হয় না—ইহাই তাঁহাদের অভিমত অধিকন্তু প্লাগা প্রভৃতি কমাইবার জন্য T. C. C. O. (Terpentine, creosote camphor of oline oil) র Intramuscnlar Intramuscnlar Injectionএর প্রয়োজন হয় কেন?

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য।—কলিকাতা এবং মফঃস্বল—বাঙ্গালার সকল স্থানের স্বাস্থ্যই এবার অনেকটা ভাল বলিতে পারা যায়। এসময় শরৎকালে জগন্মাতার আগমনের সময় মফঃস্বল বাসী ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীর প্রপীড়নে যে উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকেন, এবার অনেক স্থানেই তাহার কথা শুনা যাইতেছে না। তবে বলা যায় না ইহার পর কি হইবে।

ডেঙ্গু জ্বর।—এবার ম্যালেরিয়া কম থাকুক, ডেঙ্গু জ্বরটা কিন্তু বাঙ্গালা জুড়িয়া অপ্রতিহত ভাবে চলিতেছে। কলিকাতায় ইহার প্রকোপ একটু বেশী। এই ডেঙ্গু জ্বরের আকার এক জাতীয় ও নহে,—নানা মূর্ত্তিতে এই জ্বর দেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তবে এই জ্বরে মৃত্যুর পরিমাণ কম—এই যা মঙ্গল।

মায়ের পূজা।—বিশ্বমাতার পূজার আয়োজনে আগে যেরূপ দেশের সমগ্র অধিবাসীর মনেই একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া যাইত, এবার তাহা বড় লক্ষিত হইতেছে না। ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ দেশবাসীর দারুণ অর্থাভাব।। বাঙ্গালীর হৃদয়ে বল নাই, মনে শান্তি নাই, প্রাণে সুখ নাই, আগের মত বাঙ্গালী পূজার উৎসবে মাতিবে কেমন করিয়া! রোগের জ্বালা, শোকের জ্বালা, সর্ব্বাপেক্ষা অর্থের জ্বালাই বাঙ্গালীর এখন যে প্রবল, বাঙ্গালীর হৃদয়ে বল আসিবে কোথা হইতে! হৃদয়ের বল না থাকিলে মনের স্বস্তি অসম্ভব। দাও মা দুর্গতি হারিণী অন্নপূর্ণা জননী আমার! বাঙ্গালীর সকল দৈন্য অপনোদন করিয়া তাহাকে দু'বেলা দু'মুঠা পেট ভরিয়া খাইতে দাও, সারা বৎসর পরে তোমার পূজায় ভক্তি অর্ঘ্য প্রদানে সে আত্মহারা হইবে।

পূজার বাজার।—অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবৎসর পূজার বাজারেও যেন লোক জমিতেছে না। ক্রেতা নাই, অনেক বিক্রেতাই কেবল বিপণী সাজাইয়া বসিয়া থাকিতেছে। বড় বড় কাপড়ের দোকানে অন্যান্য বৎসর ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেরূপ কাপড় কেনা শক্ত হইত, এবার সে গণ্ডগোলই নাই। ফলে এবৎসর দারুণ অর্থ কৃচ্ছ্রতায় অনেক বিক্রেতাকেই বিষম চিন্তায় কাটাইতে হইতেছে। শুধু কাপড়ের দোকান নহে, মনোহারি দোকান, পুস্তকের দোকান—সকলের অবস্থাই প্রায় একরূপ।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক ২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ১৭।১৯নং শ্যামবাজার ব্রিজ রোড হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

IMPERIAL

আয়ুর্ব্বেদ

৮ম বর্ষ | কার্ত্তিক ১৩৩০ সাল। | ২য় সংখ্যা।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা।

(কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন)

—:*:—

কালের কুটিল আবর্ত্তনে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উত্থান ও পতন যতই হইতে থাকুক,—এ চিকিৎসার মূলে যে দৈবীশক্তি নিহিত রহিয়াছে—তাহা অবিসম্বাদিত সত্য কথা। বিশ্বস্রষ্টা স্বয়ং ব্রহ্মার মুখ হইতে এই চিকিৎসা উদ্ভূত হইয়াছিল। এজন্য দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী আমাদের রুচি বিপর্য্যয় ঘটিলেও, এ চিকিৎসার অস্তিত্ব লোপ কখনই হইতে পারে না। ঋষিযুগে এ চিকিৎসার গৌরব বিলক্ষণ বৃদ্ধি, পাইয়াছিল—তখন অন্যবিধ চিকিৎসা আবিষ্কৃতও হয় নাই। আর্য্যঋষি ইন্দ্রের নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করিয়া মর্ত্ত্যবাসী জীবদিগকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করিতে চেষ্টা করিলেন। সে চেষ্টার সাফল্য-সাধন বিশেষ ভাবেই হইল। সমগ্র জগদ্বাসী তদ্দর্শনে স্তম্ভিত হইল। আর্য্যঋষির অমূল্যরত্ন চরক ও সুশ্রুত—আরবী ভাষায় অনুবাদিত হইল। আরবীয়দিগের নিকট হইতে গ্রীকগণ ইহা ভাষান্তরিত করিলেন। গ্রীসদেশ হইতে সমগ্র পৃথিবীতে এই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাই রূপান্তরিত হইয়া প্রচারিত হইল। গুড় বল, মিছরি বল – সকল বিষয়েরই মূলে যেমন একমাত্র ইক্ষু রসই নিহিত, অ্যালোপ্যাথি বল, হোমিওপ্যাথি বল—আর হাকিমিই বল – সকলেরই মূলে কিন্তু এই আয়ুর্ব্বেদরূপ ইক্ষু রসই নিহিত রহিয়াছে। এই রসকে যিনি যে ভাবে পারিয়াছেন, সেই ভাবে ভিয়ান করিয়া নানাবিধ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু ভিয়ান করিতে গিয়া মূল পদার্থের রূপান্তর করিবার ব্যবস্থায় হয়তো গুণ, বীর্য্য, বিপাকের কিছু কিছু ব্যত্যয় ঘটাইয়াছেন। মিছরি ভিজান জল ও মিছরি ভিজান জলকে পাক করিয়া গাঢ় করিলে উভয়ের মধ্যে যেরূপ গুণের তারতম্য ঘটিয়া

থাকে—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সমগ্র চিকিৎসার মূল ভিত্তি হইলেও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সহিত অন্যান্য চিকিৎসার এইজন্য সময় সময় গুণের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ কালমেঘের তরল সার ও কালমেঘের পাতার রস; অশোকছালের কাথ এবং এক্সট্রাক্ট অশোক, ধুতুরার পাতার রস ও এক্সট্রাক্ট বেলাডোনা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রকৃত কথা—কোনো দ্রব্যের স্বরস, কাথ এবং এক্সট্রাক্টে বিস্তর প্রভেদ। কেহ ইচ্ছা করিলে একই রোগাক্রান্ত দুইটি রোগীকে স্বরস, কাথ এবং এক্সট্রাক্টের বিভিন্নভাবে প্রয়োগে কিরূপ ফল হয়—দেখিতে পারেন,—আমরা ইহা বহু স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এক্সট্রাক্ট অপেক্ষা স্বরস বা কাথে সত্যই অনেক অধিক উপকার পাওয়া যায়। দেশের লোকে একথা বুঝেন না—বলিয়াই তাঁহারা এত রোগ প্রবণ।

"যস্য দেশস্য যো জন্তু তজ্জো তদৌষধমহিতম্।" যে দেশের প্রাণী সেই দেশজাত ঔষধ সকলই যে তাহার পক্ষে অধিক উপকারী—সে কথা আর্য্য ঋষিও বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান সভ্য যুগে যে দেশে কৃত্তিবাসের রামায়ণ বা কাশীদাসী মহাভারত অপেক্ষা সেলি-বায়রণের অধিক আদর—সে দেশে এ কথায় যথার্থ্য উপলব্ধি করিবার লোক কই। মধ্যযুগে সনাতন আয়ুর্ব্বেদের অবনতি এমনই করিয়াই ঘটিয়াছিল। সাম্রাজ্যপতির নিকটও আয়ুর্ব্বেদ সাহায্য পাইল না, দেশবাসীর প্রবৃত্তিও অন্যভাবে ধাবিত হইল, কাজেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা আর দেশে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারিল না। ফলে সে বেগ সামলাইতে ইহার কয়েকজন উপাসককে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিতে হইল। অ্যালোপ্যাথি পাস করিয়াকয়েকজন কৃতবিদ্য ডাক্তার ইহার উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম নামোল্লেখ আমরা পরলোকগত ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর করিতে পারি। ইনি বিশ্ববিদ্যাল বি-এ ও মেডিকেল কলেজের এল, এম্, এস, পাস করিয়া চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া যখন দেখিলেন, অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা এখনও পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয় নাই, তখন অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ছাড়িয়া সনাতন আয়ুর্ব্বেদেরই শরণাপন্ন হইলেন। তাহার পরে কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় ইহার শরণ গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের দেখাদেখি এখন অনেক এল, এম্, এস, এবং এম্ বি ডাক্তার অ্যালোপ্যাথি অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাই যে দেশবাসীর পক্ষে সম্যক উপযোগী—ইহা বুঝিয়া আয়ুর্ব্বেদের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নষ্টপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের উপর আস্থা স্থাপন ইঁহাদের দ্বারাই ঘটিতেছে—একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব।

ঋষি বাক্যের দোহাই না হয় নাই দিলাম, কিন্তু যে সকল ডাক্তার, ডাক্তারি না করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের দেখিয়াও তো কোন চিকিৎসা আমাদের দেশবাসীর উপযোগী তাহা আমরা নির্ণয় করিয়া লইতে পারি। অধুনা ইংরাজ সমাজেও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সমাদৃত

হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদের অমূল্য রত্ন "মকরধ্বজ' এখন সকল দেশই মহামুল্য রত্ন বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সারজন উড্রফ তাঁহার "ভারতশক্তি" নামক গ্রন্থে সকল চিকিৎসা অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদেরই অধিক প্রাধান্য দিয়াছেন। যে সকল ভারত সন্তানের ভাগ্যে সে পুস্তক দেখা ঘটে নাই, আমরা তাঁহাদিগকে উহা এক এক খানি কিনিয়া পড়িতে অনুরোধ করি। তাঁহার সেই পুস্তক পড়িলে বুঝা যায়, তাঁহার পরিবার বর্গের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ভিন্ন অন্য ঔষধ স্থানই পায় না। বহুকাল পুর্ব্বে আর্য্য-ঋষি শ্লোক নিচয়ে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রাধান্য সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিলেও এযুগে সাহেবদের মুখ হইতেও আমরা যে সকল কথা শুনিতেছি, তাহাতেও তো আমাদের এই চিকিৎসারই আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য। সারজন লিকুইসের মত একজন খাস ইংরাজ ডাক্তারের উক্তি—"চরকের চিকিৎসা যদি পৃথিবীর মধ্যে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে দেশে শব-বাহকের সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইত।" কেবল মাত্র এই কথাটি শুনিয়াও আমাদের এই চিকিৎসার প্রতিই একান্ত নির্ভর করা উচিত।

আমরা বহুবার বলিয়াছি—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মুল উদ্দেশ্য—রোগ আরোগ্য করা অপেক্ষা দেশে যাহাতে রোগ না হইতে পারে—তাহারই উপায় করা। চরকের প্রথম শ্লোক হইতেই আমরা সে পরিচয় পাই। চরকের প্রথম আরম্ভ এইরূপ—

"অথাতো দীর্ঘঞ্জীবিতীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি হস্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ।"

অর্থাৎ আমরা দীর্ঘঞ্জীবিতীয় নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব—এই কথা ভগবান আত্রেয় বলিলেন।

তাহার পরেই—

'দীর্ঘঞ্জীবিতমন্বিচ্ছন ভরদ্বাজ উপাগমৎ।
ইন্দ্র মুগ্রতপা বুদ্ধা শরণ্যমমরেশ্বরম্।"

অর্থাৎ কিরূপে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারা যায়, তাহা জানিবার জন্য মহাতপা ভরদ্বাজ—ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

সূত্র, নিদান, বিমান, শারীর ও ইন্দ্রিয় স্থান বলিয়া যখন আত্রেয়—'চিকিৎসা স্থান' আরম্ভ করিলেন, তখনও এই 'রসায়ন' চিকিৎসার কথাই তাঁহার বক্তব্যের সূচনা হইল। কারণ তিনি বলিলেন রসায়ন শব্দের অর্থ—

দীর্ঘমায়ুঃ স্মৃতিং মেধামারোগ্যং তরুণং বয়ঃ
প্রভাবর্ণ স্বরৌদার্য্যং দেহেন্দ্রিয় বলং পরম্।
বাক্‌সিদ্ধিং প্রণতিং কান্তিং লভতে না রসায়নাৎ
লাভোপায়ো হি শস্তানাং রসাদীনাং রসায়নম্॥

অর্থাৎ মানুষ রসায়ন হইতে দীর্ঘআয়ু, স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য, তরুণতা, প্রভা, বর্ণ ও স্বরের পুষ্টি, দেহ ও ইন্দ্রিয়দিগের বল, বাক্‌ সিদ্ধি, প্রণতি ও কান্তি লাভ করিয়া থাকে। রসাদি ধাতু সমুহ লাভ করিবার উপায় স্বরূপ বলিয়া ইহার নাম রসায়ন।

ফল কথা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শুধু রোগীর চিকিৎসা পুস্তক নহে, মানুষ যাহাতে স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারে, সনাতন আয়ুর্ব্বেদের তাহাই মুখ্যতম উদ্দেশ্য। ধর্ম্মের

সহিত, সমাজের সহিত, সংসারের সকল কর্ম্মের সহিত আয়ুর্ব্বেদের সকল সূত্র জড়িত। যে দিন হইতে আমরা স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া সমাজের অবমাননা করিয়া, সাংসারিক কর্ম্ম সকলের শৃঙ্খলা নষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছি, সেই দিন হইতেই যে আমরা সনাতন আয়ুর্ব্বেদের সকল উপদেশ ভুলিয়া অস্বাস্থ্য ও অল্পায়ুকে বরণ করিয়া লইতেছি—এ কথা ধ্রুব সত্য, এই সত্যের সন্ধানে আমরা যতদিন না আকুল হইব, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের কোনা ক্রমেই মঙ্গল নাই। স্বদেশ ও স্বরাজ প্রয়াসী দেশের নেতৃবৃন্দ সর্ব্বাগ্রে এই কথাটি চিন্তা করুন—ইহাই আমাদের অনুরোধ।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহীনতার মূল তত্ত্ব।

(কবিরাজ শ্রীনিত্যনিরঞ্জন সেন গুপ্ত)

——:০:——

সংযমহীনতাই যে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-হানির মূল নিদান এ তত্ত্ব আয়ুর্ব্বেদ পত্রে বহু লেখক ও সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়াছে, সে সকলের পুনরালোচনা না করিয়া, পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বের বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবন, সামাজিক নীতি বন্ধন, ধর্ম্মনীতি শাসন ও পারিপার্শ্বিক দৈনন্দিন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার সমূহের আলেখ্যগুলি, বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজরূপ রঙ্গমঞ্চের তত্ত্ববিষয়ক দৃশ্যপটগুলির এতই পশ্চাতে ও এতই দূরে সরিয়া গিয়াছে ও এতদুভয় কালের ব্যবধান মধ্যে এত অধিক অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কের দৃশ্যপট আছে যে, উভয় কালের চিত্রগুলিকে পরস্পরের সান্নিধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক বিশ্লেষণ করা, বা তাহাদের সকল গুলির তন্ন তন্ন করিয়া গুণাগুণ সমালোচনা করা বহু আয়াস সাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। এ কার্য্যে যাঁহারা পথ দেখাইয়াছেন, তাহারা সমাজের প্রকৃতই হিতৈষী মহাত্মা তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই। তাঁহাদেরই মহান্ উদ্দেশ্য পথ লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাদেরই পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র লেখক এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছে।

আমরা নিয়ত শুনি ও দেখি, বাঙ্গালী জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় দুর্ব্বল জাতি। যে বাঙ্গালীর ধন আছে, তিনি স্বাস্থ্যহীনতার জন্য অসুখী। যে বাঙ্গালীর উর্ব্বর মস্তিষ্ক আছে, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি স্ফূর্ত্তি পায় না, তাহাও স্বাস্থ্যহীনতার জন্য। বাঙ্গালী কৃতবিদ্য হইয়াও জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেনা, তাহার কারণও বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-হীনতা।

এখন দেখা যাউক, এই স্বাস্থ্যহীনতার

প্রকৃত নিদান কি? পঞ্চাশবর্ষ পূর্ব্বেও যে বাঙ্গালী স্বাস্থ্য সম্পদে ধনী ছিল, আজই বা কেন তাহার স্বাস্থ্যহীনতা, অকাল মৃত্যু প্রভৃতি ঘটিতেছে?

সংযম বিমুখতা এবং তাহার অনিবার্য্য ফলে পীড়াদি ঘটিলে, স্বাস্থ্য নীতির পালনের নামে উচ্ছৃঙ্খলতাই অধুনা বাঙ্গালীর পতন ও অকালমৃত্যুর কারণ। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের বঙ্গললনাগণ, শিশু পালনে এতই নিপুণা ছিলেন, গার্হস্থ্য ও সামাজিক অনুশাসনগুলির মধ্য দিয়া নিজ নিজ শিশুগণকে এরূপে লালন পালন করিতেন যে, তখনকার দিনে বাঙ্গালী দুর্ব্বল বলিয়া জগতে পরিচিত ও অনাদৃত ছিল না। প্রথমতঃ দেখুন, শিশুকে তৈল-হরিদ্রা মাখাইয়া রৌদ্রে শোওয়াইয়া রাখা হইত। তাহাতে শিশুর কান্তি পুষ্টি বর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে, বাতাতপ সহিবার অভ্যাস বৃদ্ধি পাইত। তখন শিশুকে প্রত্যহ কাজল পরাইয়া দেওয়া হইত। মনসা সিজ পত্র, রসুন প্রভৃতির কজ্জলে শৈশব হইতেই চক্ষুর্দীপ্তি অব্যাহত থাকিয়া চক্ষুঃ ক্ষেত্রস্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাগুলি (retina) পরিপুষ্টি লাভ করিত। ফলে, বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত মনুষ্যজীবনের পরম সহায় চক্ষু দুটিতে চাল্‌শেও ধরিতনা। যদিও কদাচিৎ কাহারও চাল্‌শে ভাব হইত, প্রাণান্তেও তিনি চশ্‌মা পরিতেন না—কয়েক দিন, বই পড়িতে বা লিখিতে একটু কষ্টবোধ হইলেও, ক্রমশঃ আপনিই তাহা সারিয়া যাইত। আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায়, শৈশবাবস্থাতেই অনেকের চক্ষে চশমা উঠিয়াছে। আমরা জোর পূর্ব্বক বলিতেছি যে, অধুনা মা লক্ষ্মীরা, শিশু পালনই যে মাতৃরূপিণী নারী জাতির প্রধান কর্ত্তব্য ও বিশ্বস্রষ্টার জীব প্রবাহ রক্ষার প্রধান সহায়তামূলক পরম পবিত্র ব্রত, একথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে অনুযোগ করাও বোধ হয় অন্যায়। বর্ত্তমান বঙ্গীয় পুরুষ সমাজ যেরূপ অভিনব শিক্ষা দীক্ষার অনুপ্রাণনায়, সাধ করিয়া নিজ নিজ গৃহে ঋষিগণানুমোদিত পরম হিতকর বিধি নিষেধগুলি উঠাইয়া দিয়া, নিতান্ত ধর্ম্ম ও সমাজবিরোধী উপায়গুলির তাহাদের স্থলে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায়, সেই সমস্তই, তাঁহাদের স্বাস্থ্যনীতি পালনের নামে উচ্ছৃঙ্খলতা। বড় বড় সংসারে, পাশ্চাত্য গার্হস্থ্যনীতির অনুকরণে মহিলাগণ আজকাল নিজ নিজ শিশুর স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ভার বহিতে অসমর্থা হইয়া, নিজ নিজ শিশুগণকে আয়া বা ধাত্রীর হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত থাকেন। ঐ সকল বড় ঘরের মহিলাগণ শিশুগণের চক্ষুতে কজ্জল পরাণো বা তৈল হরিদ্রা ম্রক্ষণ করাইয়া শিশুগণের বাতাতপ সহতার গুণে অভ্যাস করাইবার প্রাচীন রীতিনীতির আবশ্যকতা আদৌ স্বীকার করেন না—এরূপ প্রসঙ্গ ঐ সকল উচ্চ ঘরে হাস্যকর অসভ্যতারই নামান্তর বলিয়া গণ্য হইবে; কিন্তু প্রায় দেখা যায়, একটু বাতাসে বাহির করিলেই শিশুর সর্দ্দি হয়, একটু আতপ তাপ লাগিলেই তাহার চক্ষুঃ লাল হয়। পাঠক মহাশয়কে বলিয়া দিতে হইবে না—এ সকলের কারণ কি? শিশুগণকে অন্ততঃ পঞ্চম ষষ্ঠ বর্ষ পর্য্যন্ত কাজল পরাইয়া দিলে যে তাহার দৃষ্টিশক্তি

আজীবন তীক্ষ্ণ ও অব্যাহত থাকে, কখনও যে তাহাকে চক্ষুরোগাক্রান্ত হইতে হয় না, ইহা পরীক্ষিত মহাসত্য। প্রাচীন কালে প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীগণেরও অঙ্গ সৌন্দর্য্য সংবর্দ্ধনার্থ চক্ষুর্দ্বয় অঞ্জন রেখাঙ্কিত না করিলে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত না। প্রাচীনকালের যুবতী মহিলাগণের নেত্রাঞ্জনের সহিত নানা প্রাকৃতিক শোভার তুলনা করিয়া কত কত মহাকবি অপূর্ব্ব বর্ণনাছায়া নিজ নিজ কাব্যের ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এহেন উত্তমাঙ্গের প্রধান প্রত্যঙ্গ যে, নয়ন, তাহার দীপ্তি ও পরিপুষ্টি যাহাতে অব্যাহত থাকে, তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই যত্নবান হওয়া উচিত নহে কি?

সংপ্রতি একদিন আমি পূর্ব্ব বঙ্গ রেল পথে, শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে মাজদিয়া যাইতেছিলাম। আমি যে কামরায় ছিলাম সেখানে একটী কিশোর বয়স্ক পরম সুন্দর চশমাধারী বালক আরোহী ছিল। ছেলেটী অভিনিবেশ সহকারে একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিল। যথাসময়ে ট্রেণ ছাড়িল, অনেকগুলি ষ্টেশন অতিক্রমপূর্ব্বক গাড়ী বারাকপুরে পঁহছিল, তথাপি বালকের ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় পাঠানুরাগ দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলাম। বালকটীর সহিত আলাপ করিবার কৌতুহল হইল। কি পুস্তক অধ্যয়ন করিতেছে জিজ্ঞাসায় স্বাভাবিক সরলতাপূর্ণ কথায় বালক বলিল, সে এবার কাঁকড়াপাড়ায় বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোনও পল্লীগ্রামের সখের থিয়েটার পার্টিতে দ্রৌপদীর ভূমিকার অভিনয় করিবে বলিয়া কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও নাট্যকার ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকের দ্রৌপদীর অংশ আবৃত্তি করিতেছে। বালকটিকে এই সুকুমার কিশোর বয়সেই দৃষ্টিক্ষীণতার জন্য চশমা পরিতে হইয়াছে দেখিয়া বস্তুতঃ বড় কষ্ট হইল। এইরূপ দৃষ্টিক্ষীণতার প্রধান কারণ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধের পূর্ব্বেই সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহীনতার ও স্বল্পায়ু হইবার কারণগুলি ক্রমশঃ দেখাইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

কালাজ্বর।

(কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:•:—

কালাজ্বরে—Antimony salts ও খাওয়ান চলেনা, যেহেতু উহা খাওয়াইলে প্রবল বমি বা অতীসার আরম্ভ হয়, সুতরাং Injection ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। যদি বুঝি তাম যে ইহার প্রভাবে আরোগ নিশ্চিত, তাহা হইলেও না হয় এই বিপদসঙ্কুল চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে লোককে উপদেশ দেওয়া যাইত। কিন্তু কই তাহাওত সর্ব্বত্র দেখা যায় না। পক্ষান্তরে যখন দেখিতে পাই যে আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসা করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায় এবং এই সকল ঔষধ প্রয়োগে কোনওরূপ বিপদের আশঙ্কা নাই, তখন আমরা দেশবাসিগণকে কালাজ্বরের চিকিৎসার জন্য আয়ুর্ব্বেদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করি। ইহা শুধু মুখের কথা নহে, আয়ুর্ব্বেদমতে কালাজ্বর অতি সুন্দর ভাবে চিকিৎসিত হইয়া থাকে। আমরা সকলেই যে প্রণালীতে চিকিৎসা করি তাহার ফল বেশ সন্তোষ জনক।

ডাক্তারগণ বলেন, "আমরা ছাতিম, গুলঞ্চ, নাটা, রসুন, দারুহরিদ্রা, চিরেতা প্রভৃতি ঔষধ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি কালাজ্বরে ইহাদের কোনটীই কার্য্যকরী হয় না।" তাঁহাদের এ পরীক্ষার কোনও মূল্য নাই। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ সাধারণতঃ শাস্ত্রীয় ঔষধই ব্যবহার করেন এবং এই সকল ঔষধ একাধিক ভেষজের সংমিশ্রনে প্রস্তুত। দ্রব্য দ্রব্যান্তরের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহার যে গুণোৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহা অবিসংবাদী-সত্য। ঔষধের গুণ প্রসঙ্গে মহর্ষি-চরক বলেন—

"বহুতা—তত্র যোগ্যত্বমনেকবিধ কল্পনা।
সম্পচ্চেতি চতুষ্কোঽয়ং ভেষজানাং গুণাঃস্মৃতাঃ

বহুতা অর্থাৎ একাধিক দ্রব্য সংযোগ ভেষজের প্রথম এবং প্রধান গুণ—।

সংপ্রতি কলিকাতায় যে স্বাস্থ্য সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহা হইতে কয়েকজন ডাক্তার বারাসত, দত্তপুকুর, দোগাছিয়া প্রভৃতি স্থলে যাইয়া কালাজ্বরের Injectcion দিয়া আসিতেছেন এবং তৎসহ আমার বন্ধু কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত কাব্যতীর্থ মহাশয় সেখানে তাঁহাদের সহিত আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসা করিয়াছেন। সেখানকার বিবরণীতেই প্রকাশ—Injection অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাতেই অধিকতর ফল পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী সার্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বাস্থ্য বিভাগের কমিশনার ডাঃ বেণ্টলী সাহেব—স্বাস্থ্য

সমিতির কার্য্য পরিদর্শনার্থ সেখানে যাইয়া উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা নৈপুণ্য দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য যাঁহারা Bovril Panopeptan প্রভৃতি খাওয়াইয়া একদিকে যেমন হিন্দুর ধর্ম্ম, অন্যদিকে তেমনি কোটি কোটি টাকা প্রতিবৎসর বিদেশে পাঠাইয়া দরিদ্রের ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই নষ্ট করিতেছেন, দেশবাসী তাঁহাদের কথায় আস্থা স্থাপন করিবেন, না—ত্রিকাল-দর্শী লোকহিতপরায়ণ আর্য্যঋষিগণের সুচিন্তা-প্রসূত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অধিকতর—আস্থা স্থাপন করিবেন।

আমরা কালাজ্বরের উৎপত্তি ও চিকিৎসা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের মতগুলি পাশ্চাত্য মতের সহিত বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব যে আয়ুর্ব্বেদের রোগ নির্ব্বাচন এবং ঔষধের ব্যবস্থা য়্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান অপেক্ষা অধিকতর সুচিন্তিত ও সুফলপ্রদ।

ক্রমশঃ

সিদ্ধ-প্রদ মুষ্টিযোগ।

(কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

—:•:—

চিকিৎসাতত্ত্বের বিষয় আমার ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্য নহে। কেবল কয়েকটি রোগের সিদ্ধ-প্রদ মুষ্টীযোগ নিম্নে লিখিত হইল, তাহার অধিকাংশ আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এবং বিশ্বস্ত প্রাচীন চিকিৎসকও সন্ন্যাসী বাবাজীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। তাঁহারা যে যে সিদ্ধি-প্রদ মুষ্টিযোগ প্রয়োগে ফললাভ করিয়াছেন, সেই সেই মুষ্টিযোগই গৃহীত হইয়াছে। মুষ্টিযোগগুলি কিরূপ ফলপ্রদ, পরীক্ষায় তাহা প্রমাণিত হইবে। আমার অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

১। রক্তা-তীসার রোগে :—হরিদ্রাচূর্ণ, বালাচূর্ণ ও মধু প্রত্যেক দ্রব্য একআনা ওজনে একত্রে সেবন করিলে রক্তাতীসার আরোগ্য হয়।

(ক) বটপাতা বাসিজলে বাটিয়া সেবন করিলে রক্তাতীসার আরোগ্য হয়।

(খ) আমের ছাল ২ ভরি কাজির সহিত বাটিয়া প্রাতে অর্দ্ধেক সেবন করিলে রক্তাতীসার নিবারণ হয়।

২। আমাশয় রোগে :—কাঁচা আম্র লবণসহ খাইলে আমাশয় আরোগ্য হয়।

(ক) মাস কলাইয়ের দাইল বাটিয়া উহার সহিত কিয়ৎ পরিমাণ হিং মিশ্রিত করিয়া কলাপাতা দিয়া জড়াইয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অন্নের সহিত ভক্ষণ করিলে আমাশয় রোগের শান্তি হয়।

(খ) অনেকদিনের পুরাতন তেঁতুল এক ছটাক, একপোয়া শীতল জলে রাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতে সেই জল ছাঁকিয়া লইয়া উহার সহিত কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে আমাশয় রোগের শান্তি হয়।

(গ) আমন ধান্যের চাউল কাটখোলায় ভাজিয়া ভস্ম করিবে এবং একপোয়া জলে উহা নিক্ষেপ করিবে। পরে উহা শীতল হইলে উহার সহিত সামান্য চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তামাশয় নিবারিত হয়।

৩। গ্রহণী রোগে :—পাকাবেল, ভিজান চিঁড়ার সহিত সেবন করিলে, দুষ্ট গ্রহণী নিরাময় হয়।

(ক) ঘোলের সহিত পাকাবেল ও চিনি দিয়া সেবন করিলে গ্রহণী আরোগ্য হয়।

(খ) বক পুষ্পের মূল বাসি জলে ঘর্ষণ করিয়া উহা ১ তোলা পান করিলে গ্রহণী রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে, ইহা পরীক্ষিত।

৪। ভেদ নিবারণ :—যে কোন কারণে হউক না কেন, অধিক পরিমাণে ভেদ হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ ভেদ নিবারিত হইবে। জায়ফল ১ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা, গুজরাটী এলাচ অর্দ্ধ তোলা, মধু ২ তোলা.—এই দ্রব্যগুলি চূর্ণ করিয়া মধু দিয়া মাড়িয়া মটর প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া উহা বাসি জলের সহিত বাটিয়া একটি বটিকা সেবন করিলে ভেদ নিবারিত হইবে। যদি এক বটিকাতে সম্পূর্ণ নিরাময় না হয়, তাহা হইলে আর একটি বটিকা সেবন করিবে। ইহা বিসূচিকা রোগেও উপকার হয়। ইহা প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে গৃহে প্রস্তুত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

৫। কর্ণে-তালা-লাগা :—আদা চর্ব্বণ করিয়া জলে ডুব দিলেই কাণের তালা তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া যায়।

(ক) কর্ণে চাপিয়া আড়াইটা মরিচ চর্ব্বন করিয়া মুখ বন্ধ করতঃ কাণের চাপা ছাড়িয়া দিলে তালা লাগা নিবারিত হয়।

(খ) সরিষা তৈল গরম করিয়া কর্ণে দিলে কাণের তালা লাগা নিবারিত হয়।

(৬) ফোড়া, কুচ্‌কী প্রভৃতি বসাইবার মুষ্টিযোগ :—রশুনের রস ও মেটে সিন্দুর একত্রে মিশ্রিত করিয়া কুচ্‌কী, ফোড়া ও বাঘিতে দিলে বসিয়া যায়।

(ক) ছোট গোয়ালের পাতা হুঁকার জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া, কুচ্‌কী, বাঘি বসিয়া যায়।

(খ) ৭টা পাকা তেঁতুল বীজের শাঁস, চিনাবাসন ভাঙ্গার গুঁড়া ১ ছটাক, মনসা গাছের পাতা—অগ্নিতাপে উষ্ণ করতঃ তাহার রসে বাটিয়া ফোঁড়া কুঁচ্‌কী ও বাঘিতে প্রলেপ দিতে হইবে। পরে তাহার উপর ভেরেণ্ডার পাতা ও তদুপরি তুলা দিয়া উত্তমরূপে বাঁধিয়া রাখিবে। তাহা হইলে সমস্ত দূষিত রক্ত জল হইয়া প্রস্রাব দ্বার দিয়া নির্গত হইবে।

৭। নাসা রোগে :—এক তোলা গেটীয়া-দুর্ব্বাঘাস, এক তোলা হরীতকী, এক তোলা বহেড়া, এক তোলা কাঁচা আমড়ার শাঁস, এক তোলা বটফল, এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করতঃ নস্য গ্রহণ করিলে নাসা রোগ নিবারণ হয়।

(ক) অর্দ্ধ পোয়া বাসক পাতা, অর্দ্ধ পোয়া মধু এই উভয় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া প্রাতে অর্দ্ধেক ও বৈকালে অর্দ্ধেক সেবন করিলে নাসা রোগ নিবারিত হয়।

(খ) তিলফুল চূর্ণ সরিষা তৈলের সহিত বাটিয়া সূর্য্যপক করিয়া তাহা মস্তকের তালুতে প্রলেপ দিবে ও ঐ তৈলের নাস লইলে নাসা রোগ নিবারিত হয়।

৮। বালসা নিবারণ:—শিশুদিগের উৎকাশি, কণ্ঠনালী ঘড়ঘড়ানি, কফ প্রভৃতিকে বালসা বলে। ইহাতে শিশুরা অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকে। রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, কেবল কাঁদিতে থাকে, স্তন পান করিতে পারে না, ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও কাহিল হইয়া পড়ে।

একটা গোটাপান, একটা লবঙ্গ, এক আনা জায়ফল চূর্ণ, এক তোলা জলের সহিত বাটিয়া প্রদীপের শিখায় উষ্ণ করিয়া দুই তিন দিন ব্যবহার করাইলে শিশুর সমস্ত পীড়া নিবারণ হইয়া পূর্ব্বের মত দুগ্ধ পান ও হাস্য করিবে।

৯। বালকের সর্দ্দি:—বালকের সর্দ্দি বুকে বসিলে রামতুলসীর পাতার রস শম্বুকের খোলার মধ্যে পুরিয়া উষ্ণ করতঃ সেবন করাইলে সর্দ্দি উঠিয়া বা অধো হইয়া যায়।

(ক) কানোড় গাছের পাতার রস এক ঝিনুক পরিমাণ শিশুকে খাওয়াইলে বমির সহিত সর্দ্দি উঠিয়া যাইবে এবং শিশু সুস্থ হইয়া নিদ্রা যাইবে।

১০। ঘুর্ণি রোগে:—যাহাদের সময়ে সময়ে মস্তক ঘুর্ণিত হইতে থাকে, তাঁহারা অন্নের সহিত প্রথম কচি দুর্ব্বাঘাস ভাজা এক তোলা, তৎপরে বীজহীন ডুমুর ভাজা এক তোলা খাইবেন এবং মস্তকে লাউয়ের তৈল মর্দ্দন করিবেন, তাহা হইলে ঘুর্ণি রোগ নিবারিত হইবে।

১১। মাথাধরা:—ময়দা পাতলা করিয়া জলে গুলিয়া রগে লাগাইলে মাথাধরা আরোগ্য হয়।

(ক) মুথার রস রগে মালিশ করিলে মাথাধরা আরোগ্য হয়।

(খ) হস্তের পেশী সকল রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিলে তৎক্ষণাৎ মাথাধরার যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

(গ) পানের উলটা পিটে চুণ লাগাইয়া দুই দিকের রগে বসাইয়া দিলে মাথাধরা নিবারণ হয়।

(ঘ) উনানের পোড়ামাটি ও গোলমরিচ চূর্ণ সমভাগে মিলাইয়া নস্য লইলে মাথাধরার শান্তি হয়।

(ঙ) আলকুশীর মূল আমানির সহিত বাটিয়া দুই রগে প্রলেপ দিলে শিরঃশূল নিবারণ হয়।

(চ) মাথাধরায় অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতে থাকিলে—একটু জলে কাশীর চিনি গাঢ় করিয়া গুলিয়া ইহার নাস লইলে বিশেষ ফল হয়।

১২। আধকপালে:—হরিণের শিং—রক্ত চন্দনের সহিত ঘসিয়া কপালে দিলে আধ কপালে আরোগ্য হয়।

(ক) শ্বেত অপরাজিতার শিকড় দক্ষিণ কর্ণে বাঁধিয়া রাখিলে সকল রকম শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়।

(খ) শিমুল তুলার ধুম—নাকে দিয়া টানিলে অথবা শিমুল ফুলের কুঁড়ি জল সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে আধকপালে ভাল হয়।

১৩। জিহ্বায় ঘা বা মুখের ঘায়ে:—আধ সের দুধ ও আধসের জল একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ২ তোলা কাঁকড়ার পা সিদ্ধ

করিবে, আধসের থাকিতে নামাইয়া তাহাতে বারংবার কুলকুচা করিলে সকল প্রকার মুখ রোগ আরোগ্য হইবে।

(ক) তুঁতে পোড়াইয়া সাদা হইলে, সেই ছাই ও গাওয়া ঘি একসঙ্গে মাড়িয়া জিহ্বায় দিলে সদ্য সদ্য উপকার পাইবে। দিনে ২ বার ব্যবহার করিবে।

(খ) রসাঞ্জন (বেনের দোকানে পাওয়া যায়) ইহা কিঞ্চিৎ মধুসহ পাথরে ঘসিয়া চন্দনবৎ হইলে জিহ্বায় দিনে ২ বার প্রলেপ দিবে, সদ্য সদ্য জিহ্বার ঘা আরাম হইবে।

১৪। গর্ভপাত নিবারণের উপায় :—আপাংয়ের শিকড় তুলিয়া রমণীর কোমরে বাঁধিয়া রাখিলে গর্ভপাত নিবারণ হয়। ইহা পরীক্ষিত।

(ক) চাকে কাজ করিবার সময় কুমোরের হাতে যে মাটি লাগে, সেই মাটি আধ তোলা, এক পোয়া ছাগ দুগ্ধের সহিত গুলিয়া আধ তোলা মধুসহ খাইলে অকালে প্রসব বেদনা উঠিলে তাহা বন্ধ হইয়া যায় এবং গর্ভপাতের আশঙ্কা থাকে না। ইহা পরীক্ষিত।

১৫। সুপ্রসব :—নাগদানার মূল ও চিতার শিকড় সমপরিমাণে একত্র বাটিয়া ।০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে মৃত বা জীবিত গর্ভ শীঘ্রই প্রসব হইয়া যায়।

(ক) আফুলা তেঁতুলের শিকড় প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে গর্ভিনীর সামনের চুলে বাঁধিয়া দিবে। প্রসব হইবামাত্র ঐ শিকড় চুল সহ তৎক্ষণাৎ কাটিয়া ফেলিবে। ইহা পরীক্ষিত। যদি কেহ পরীক্ষা করেন, তবে ফলাফল আমাদিগকে জ্ঞাত করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

১৬। স্তন দুগ্ধ বৃদ্ধির উপায় :—চারি আনা কুষ্মাণ্ডের চূর্ণ আধ পোয়া দুগ্ধের সহিত ৭ দিন প্রাতঃকালে সেবন করিয়া স্তন দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

(ক) নীলশুঁদি ফুলের পেঁড়ো বাটিয়া এক আনা মাত্রায় তিন দিন সেবন করিলে স্তনে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

(খ) ভুমি কুষ্মাণ্ডের মুল চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা আতপ তণ্ডুল চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা, এক ছটাক দুগ্ধের সহিত প্রতিদিন সেবন করিলে স্তন দুগ্ধ বৃদ্ধি হইবে।

১৭। সূতিকা রোগে :—ডাক পক্ষীর মাংস গোলমরিচের সহিত ঝোল রান্ধিয়া তিন দিন সেবন করিলে সূতিকা রোগ আরোগ্য হইবে।

(ক) মাগুর কিম্বা কৈ মৎস্য, ধনিয়া ও পূঁইশাকের শিকড় বাটা দিয়া ঝোল রান্ধিয়া সূতিকারোগগ্রস্থাকে অন্নের সহিত খাইতে দিবে। যতক্ষণ তিক্ত না লাগে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত খাইতে দিবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সূতিকা রোগ নিরাময় হইবে।

(খ) কৃষ্ণ জীরা, হরিদ্রা, বিটলবণ, চই, সৈন্ধব, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ) যমানী, শ্বেতজীরক, দারুহরিদ্রা এই সকল সমপরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে সূতিকাবস্থার অজীর্ণ ও আমবাত আরোগ্য হয়।

(গ) ঝাঁটি ফুলের মুল ২ তোলা—অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উহার সহিত অর্দ্ধ তোলা পিপুল চূর্ণ দিয়া সেবন করিলে সূতিকা জ্বর আরোগ্য হয়।

(ঘ) একটী টিকটিকির ল্যাজের ডগের সামান্ত অংশ পাকা কাঁঠালি কলার ভিতর পুরিয়া একটী দিন মাত্র একবার খাওয়াইলেই সূতিকায় যাবতীয় উপসর্গ বিদূরীত হয়।

১৮। অর্শ রোগ :—ট্যাকশালে অর্থাৎ যে স্থানে প্রচুর রৌপ্য গালিত হয়, তথাকার ঝুল গলাইলেও তাহা হইতে রৌপ্য প্রাপ্ত হইয়া যায়, সেই রৌপ্যের অঙ্গুরী প্রস্তুত করিয়া বাম হস্তে ধারণ করিলে অর্শ রোগ আরোগ্য হয়।

(ক) শনি কিম্বা মঙ্গলবারে শিরিষ বৃক্ষের সূক্ষ্ম মূল সংগ্রহ করিয়া তুলসী ক্ষেত্রে স্থাপন করিতে হয়। পরদিবস প্রাতে রোগী স্নানান্তে নিবিষ্ট চিত্তে শ্রীশ্রী৺কালীকাদেবীর উদ্দেশে প্রণাম পূর্ব্বক বিশুদ্ধ তাম্র নির্ম্মিত মাদুলী মধ্যে উহা প্রবেশ করাইয়া কোমরে ধারণ করিবে। আরোগ্যান্তে কালীকাদেবীর পূজা দিবে। ঔষধ ধারণের দিবস হইতে প্রত্যহ অন্নাহার কালে যে কোন পোড়া দ্রব্য সংযোগে প্রথম তিন গ্রাস অন্ন ভোজনের বিধি আছে। এই ঔষধে লক্ষ লক্ষ অর্শরোগী রোগমুক্ত হইয়াছেন। ইহা কালিকাদেবীর স্বপ্নাপ্ত ঔষধ।

১৯। নালী ঘা ও পচা ঘা :—ছোট গোয়ালিয়ার পাতা বার আনা, আপাং মূল চার আনা একত্রে বাটিয়া ঘায়ের উপর প্রলেপ দিবে। নিম পাতা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল দিয়া দুই বেলা ঘা পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া উপরিউক্ত ঔষধ প্রত্যহ ২ বার ব্যবহার করিবে।

(ক) পাঁচ আঙ্গুলে নামক লতার মূল কুট্টিত করিয়া পরিমাণ মত বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতে বেশ করিয়া ভাজিয়া লইবে। পরে ভর্জ্জিত মূলগুলী ঘোর লাল বর্ণ ধারণ করিলে ঘৃত নামাইয়া ছাঁকিয়া লইলেই ঔষধ প্রস্তুত হইল। এই ঘৃতে যাবতীয় বাতবেদনা, দুরারোগ্য কষ্টপ্রদ ক্ষত রোগ, দুষ্টক্ষত, নালী ঘা, উপদংশ জনিত ক্ষত, অর্শক্ষত, খোষ, পাঁচড়া, নারাঙ্গা ঘা, কাণের ঘা, কাণে পূঁয হওয়া প্রভৃতি যাবতীয় ক্ষত রোগ সত্বর বিনষ্ট হয়।

আয়ুর্ব্বেদে শল্য চিকিৎসা।

[শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ]

—:০:—

অনেকেই জানেন, আয়ুর্ব্বেদে শল্য চিকিৎসা নাই, ছিলও না, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সহিত যিনি বা যাঁহারা পরিচিত, তাহারা দেশীয় শাস্ত্রে শল্য চিকিৎসা উঠিয়া যাওয়ায় বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন। সুশ্রুতে শল্য চিকিৎসার বিবরণ ও দেহের অস্থি-স্নায়ুর নাম জানিতে পারা যায়। পাশ্চাত্য চিকিৎসা আমাদের সমাজে প্রবেশ করার পর হইতে দেশীয় শল্য চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। এখন প্রাচীন শল্য

চিকিৎসাকে ফিরাইয়া আনিবার উপায় কি নাই? আমি মনে করি দেশীয়ের সঙ্গে বিদেশীয় অস্ত্র বিদ্যার মিলন করিয়া উভয়ের সংমিশ্রনে একটা নূতন অস্ত্র চিকিৎসার সৃষ্টি করিলে ভাল হয়, যদি এই পন্থাকে সকলে ভাল মনে করেন তবে ইহার দিকে সকলে মনোযোগ করিলে ভাল হয়।

অধুনা আয়ুর্ব্বেদে ঔষধ দিয়া শল্য চিকিৎসার কার্য্য হইয়া থাকে, তাহারই দৃষ্টান্ত ও বনজ ভেষজের প্রভাব দেখাইব। আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার পেটে এক ফোড়া হইয়া কাতর হই। ফোড়াটা পেটের অর্দ্ধাংশ দখল করিয়া বসে। ফোড়া হইল, কিন্তু তাহারা বেদনা বা যন্ত্রণা নাই। আশ্চর্য্যের কথা নহে কি? ঐ সময় ময়মনসিংহ হইতে বাড়ী আসিব, আমার গুরুঠাকুরও তথা হইতে বাড়ী আসিবেন। আমি তাঁহার সঙ্গে আসিয়া রাম অমৃতগঞ্জ রেল ষ্টেসনে নামিলাম, এখান হইতে আমার বাড়ী তিন মাইল, তাড়াতাড়ি আসিয়াছি বলিয়া বাড়ী হইতে হাতী, গাড়ী বা পাল্কী আনিবার জন্য লিখিতে পারি নাই। হাঁটিয়া বাড়ী চলিলাম। অর্দ্ধেক পথ যাইতেই আমার ফোড়ার উপর যন্ত্রণা হইতে লাগিল। বাড়ী আসিয়া দেখি—উহা দ্বিগুণাকার বর্দ্ধিত হইয়াছে। গ্রামের প্রাচীন প্রবীন ভাল ডাক্তার ডাকাইলাম। তিনি আসিয়া বলিলেন, "আপনি হাঁটিয়া আসাতে ইহা যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছে ও পাকিয়াছে, ইহা ভালর লক্ষণ, কিন্তু আমি ইহা কাটিতে চাই না। কারণ, আপনার ময়মনসিংহে বাসাবাটী রহিয়াছে, সেখানে গেলে বড় ডাক্তার দিয়া কাটাইবেন। যদি হঠাৎ কোন দোষ ঘটে তবে আমিও লজ্জিত হইব, আপনিও কষ্ট পাইবেন।" "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্য"—করিয়া আমি পাল্কী ডাকাইয়া ময়মনসিংহ যাত্রা করিলাম, সঙ্গে গ্রামের বা বাড়ীর ডাক্তারকেও লইয়া গেলাম।

সহরে তখন ভাল ডাক্তার দুইজন। উভয়েই এল, এম, এস। বাবু পূর্ণচন্দ্র গুহ কায়েত সরকারী ডাক্তার আর বাবু পূর্ণচন্দ্র দাস (আগে সরকারী ডাক্তার ছিলেন) বাহিরে ব্যবসা করেন, তাঁহাদের উভয়কেই ডাকিলাম। দুইজনেই বলিলেন "পাকিয়াছে, কাটিতে হইবে।" আমি কিন্তু সেদিন তাহাতে মত দিলাম না। দুই দিনে আরও ডাক্তার কবিরাজ দেখাইলাম, তাঁহারাও কাটিবার উপদেশ দিলেন। ফলে কাটাই সাব্যস্থ হইল। যেদিন কাটিব, সেদিন পূর্ণবাবুকে পাইলাম না। পূর্ণ দাস কাটিলেন। উহাতে নালী ধরিয়াছে বলিয়া কাটিতে হইল। পূর্ণ বাবু বেশী করিয়া কাটিলেন না। তিনি যখন ছুরী উঠাইলেন আমি বলিলাম "যতটুকু কাটিবার দরকার একবারেই কাটিয়া ফেলুন, বার বার কষ্ট পাইয়া দরকার কি?" তিনি কাটিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। তারপর যন্ত্রণা হইতেছে দেখিয়া পুনরায় তাঁহাকে ডাকিলাম, তিনি আসিয়া আবার কাটিয়া দিলেন। তারপরও যন্ত্রণা হইতেছে দেখিয়া পুনর্ব্বার ডাকাইলাম। তিনি আবার কাটিতে হইবে বলিলেন। আমি লাউ, কুমড়ার মত আর কাটিতে দিব না বলিলাম।

আমার এই অবস্থা দেখিয়া আমার খুল্লতাত ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত হরিহর চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক হাতুড়িয়া কবিরাজ নিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহার

ঔষধ লাগাইয়া দিলাম—উহা একটা গাছের পাতা মাত্র। পরদিন সে আসিয়া ঘা দেখিয়া নাচিয়া উঠিল। সকলেই দেখিলেন, আর কাটিবার প্রয়োজন নাই, নালীও অনেকটা ভরিয়া গিয়াছে। সেই দিন ডাক্তারকে আনিয়া দেখাইলাম, তিনি বলিলেন, "বেশ হইয়াছে।" কিসে এমন হইল তা, আর বলিলাম না, কারণ তিনি হাতুড়িয়ার এই ঔষধ দিতে বারণ করিয়াছিলেন। তারপর দিন দেখি ঘা খুব লাল হইয়াছে, নালীও নাই। আবার ডাক্তার আনিয়া দেখাইলাম, তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে এমন হইল?" আমি বলিলাম—সেই হাতুড়িয়ার ঔষধে এমন হইয়াছে।" তিনি "হুঁ" বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। আমি অনুসন্ধানে জানিলাম, আমি যে হাতুড়িয়ার ঔষধ লাগাইতেছি, একজন কবিরাজ তাঁহাকে এই ঔষধ শিখাইয়া দিয়াছেন। সে আদালতে সব জজের চাপরাশী ছিল। এই ঔষধ পাইয়া চাকরী ছাড়িয়া এই চিকিৎসা করিয়া সে দুই পয়সা বেশ উপার্জ্জন করিতেছে।

বাবু প্রাণনাথ বসু ময়মনসিংহের প্রবল প্রতাপ পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার। তিনি আমার একজন বন্ধু। একদিন একজন দারোগা আসিয়া আমার বাসায় বলিয়া গেলেন "প্রাণনাথ বাবু ঘোড়া হইতে পড়িয়া হাতের হাড় ভাঙ্গিয়াছেন, আপনাকে দেখিতে চান।" আমি অনতিবিলম্বে তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। তিনি শয্যায় পড়িয়া, তাঁহার পত্নী আমাকে ঐ হাতুড়িয়াকে আনিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। আমি তাহাকে ডাকাইয়া আনিলাম। সে কহিল—"আমার ঔষধে যে হাড় জোড়া—লাগিতে পারে তা জানি না। সে কবিরাজও আমাকে কিছু বলেন নাই।" আমি জানিতাম আমার বাড়ীর কাছে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক হাড় জোড়া লাগিতে পারে—এমন ঔষধ গাছড়া দিয়া দেয়। আমি বাড়ী আসিয়া তাহাকে ডাক দিয়া আনাইলাম। আমার কাছে শুনিয়া তিনি থানায় যাইতে চাহিলেন। থানার দারোগা চৌকিদার দিয়া সেই বৃদ্ধাকে ময়মনসিংহে পাঠাইয়া দিলেন। ফলে গাছড়ার ঔষধ দেওয়ায় তিনদিনেই হাড় জোড়া লাগিয়া গেল। সিভিল সার্জ্জন আসিয়া বলিলেন, বেশ হইয়াছে, যে ঔষধ দেওয়া হইতেছে তাহাই দেওয়া হউক।" পরে যখন বৃদ্ধার কথা শুনিলেন, তখন সে বৃদ্ধাকে ডাকাইয়া ঔষধের নাম ও প্রয়োগ জানিতে চাহিলেন। কিন্তু সে স্ত্রীলোক ঔষধ জানাইল না, অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া টাকা দিতে চাহিলেও সে অস্বীকার করিল। এই সকল ঔষধ ইংরাজী ভৈষজ্য-তত্ত্বে স্থান পায় না।

আমিও স্ত্রীলোকটিকে আনিয়া ডাক্তার সাহেবকে ঔষধটা বলিয়া দিতে চাহিলাম, সে বলিল না। এ দিকেও প্রাণনাথ বাবু সে স্ত্রীলোককে কিছু টাকা পুরস্কার আমার মারফতে দিতে চাহিলেন। সে স্ত্রীলোক বলিল, আমাদের বাড়ীতে রামমণী সেন কবিরাজ ছিলেন। তাঁহার কাছ হইতে এই ঔষধ পাইয়াছি। আমার ইহা কাহাকেও শিখাইতে উপদেশ নাই। অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, রামমণীর পুত্র বা পৌত্র কেহই সে ঔষধ জানেন না। ক্রমে এই সকল ঔষধ লোপ পাইয়া যাইতেছে।

আর একটা চিকিৎসার বিবরণ বলিয়া

প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমার এক জন ভৃত্যের পুত্রের পেটে বেদনা হইল, সঙ্গে জ্বরও ছিল। ডাক্তার ডাকা হইলে ঔষধ ব্যবহারে কিছুই হইতেছে না দেখিয়া আমাদের গ্রামের একজন ভাল কবিরাজকে ডাকা হইল। তিনি রোগী দেখিয়া বলিলেন, "ইহার পেটে ফোড়া হইয়াছে।" আমি শুনিয়া তাহাকে ময়মনসিংহ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব স্থির করিলাম। কবিরাজ বলিলেন, "আমি কয়েক দিন দেখিয়া লই।" ফলে তিনি কজ্জলী যোগ ও কৃষ্ণ চতুর্মুখ ব্যবহার করিতে দিলেন, আর ময়দা ও ঘিএর পুলটিশ্ উপরে দিলেন, তাহাতেই পেটের ভিতরকার ফোড়া পাকিয়া ভিতর দিয়া গলিতে আরম্ভ করিল। ডাক্তার আসিয়া গুহ্য দ্বার দিয়া পুয রক্ত নির্গম দেখিয়া কহিলেন—"ইহার আমাশয় হইয়াছে।" কবিরাজ বলিলেন,—ফোড়া গলিয়া পুয রক্ত পড়িয়াছে। নতুবা আমাশয় হইত তার নাভীর গোড়ায় বেদনা ও যন্ত্রণা এবং পুষ নির্গমনের সময় কুন্থন থাকিত।" যাহা হউক, কয়েক দিন পরে রোগী আরোগ্য লাভ করিল। রোগীকে উল্লিখিত সাধারণ ঔষধ ব্যতীত আর কিছুই দেওয়া হয় নাই। অতি সহজে রোগী আরোগ্য লাভ করিল। এই রোগীকে যদি হাঁসপাতালে বা ডাক্তারের হাতে দেওয়া হইত, তবে তাহারা হয়ত পেটের উপর দিয়া ভিতরকার ফোড়া কাটিতেন, তখন হয়ত রোগীর প্রাণ সংহার হইত বা ডাক্তারের হাতেই তাহার ইহলীলার সকল ভোগ টুটিয়া যাইত।

দ্রব্যগুণ।

(কবিরাজ শ্রীভুবনেশ্বর গুপ্ত কবিরঞ্জন)

—:০:—

চিকিৎসক মহোদয়গণ সমীপে সবিনয় নিবেদন—

বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, দ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান লাভই চিকিৎসা কার্য্যে সিদ্ধি লাভের প্রধানতম উপায়। মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন যে, যিনি দ্রব্যের বাহ্যাভ্যন্তর প্রয়োগ ও সংযোগ বিয়োগ জানেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হইবেন। চিকিৎসকগণ ইহা জানিয়াও সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইল এ যাবৎ দ্রব্যগুণ বিষয়ক বিশেষ সমালোচনা বা উহার উৎকর্ষ সাধনে একেবারে নিশ্চেষ্টই রহিয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদের অবনতির ইহাই একমাত্র কারণ। মনুষ্য শরীরে বাহ্য ও আভ্যন্তর এমন কোন রোগ জন্মিতে পারে না—যাহা ভেষজ প্রয়োগে অনায়াসে আরোগ্য না হয়, এই ভেষজ প্রধান দেশে অস্ত্র চিকিৎসার কোন আবশ্যক হয় না। সুশ্রুত সংহিতা প্রণেতা কাশীর রাজা মহর্ষি দিবোদাস ধন্বন্তরিই জগতে অস্ত্র চিকিৎসার প্রথম প্রবর্ত্তক, তৎকালে কিছুদিন

অস্ত্র চিকিৎসার প্রধান্যও হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভেষজ প্রভাবে ক্রমশঃ উহা লয় হইয়া গেল। সুতরাং সুশ্রুত সংহিতাও মলিনতা প্রাপ্ত হইলেন। বর্ত্তমান সময়ে তো অস্ত্র চিকিৎসা উন্নতির চরম সীমাতেই উঠিয়াছে, তথাপি এখনও অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন যে, মহাপ্রাজ্ঞ অস্ত্র চিকিৎসকগণের ঐকান্তিক চেষ্টাতেও যে রোগ আরোগ্য হইল না, সেই রোগ কোন সামান্য ব্যক্তি কোন গাছের পাতা বা ফুল দ্বারা অনায়াসে আরোগ্য করিয়া দিল। আছে সবই, জানিতে চেষ্টা করে কে? যিনি যখন যে কোন গুণবিশিষ্ট দ্রব্য জানিতে ইচ্ছা করিবেন, তৎক্ষণাৎ উহা জানিবার যোগ্য কোন গ্রন্থ না থাকাতে দ্রব্য গুণের আলোচনাই একরূপ রহিত হইয়াছে এবং যে সমস্ত দ্রব্যগুণ সংগ্রহ গ্রন্থ প্রচলিত আছে উহাও ব্যবহারে আসেনা।

অতএব আমি বহু চিন্তা চেষ্টা ও পরিশ্রম সহকারে "দ্রব্যগুণ দর্পণ" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া উহার প্রথম খণ্ড মুদ্রিত করিয়াছি, এই খণ্ডে ভুমির গুণাগুণ পঞ্চভুতের গুণ, যে ভূতের আধিক্যহেতু যে রস ও যে গুণ জন্মে, এবং রস, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাবাদির গুণ ও কার্য্যাদি এবং প্রত্যেক রস বিশিষ্ট, প্রত্যেক বীর্য্য বিশিষ্ট,প্রত্যেক বিপাক বিশিষ্ট, এবং প্রত্যেক দোষ নাশক ও জনক এবং প্রত্যেক রোগ নাশক ও জনক ইত্যাদি এক এক গুণ বিশিষ্ট যত দ্রব্য আছে তৎসমুদয় এক এক স্থানে পৃথক পৃথক ভাবে লিখিত হইয়াছে, ইহা ভিন্নও দ্রব্যগুণ সংক্রান্ত বহু জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত হইয়াছে। এখন যখন যিনি যে কোন গুণবিশিষ্ট দ্রব্য জানিতে ইচ্ছা করিবেন তৎক্ষণাৎ ঐ গুণ বিশিষ্ট যত দ্রব্য আছে তৎসমুদয়ই এই গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন।

আর এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে শ্লোকাকারে সংস্কৃত নাম, দেশ বিদেশের ভাষা নাম, ডাক্তারী নাম, দ্রব্যের স্বরূপ বর্ণন, জারণ, মারণ, শোধন প্রণালী, গুণাগুণ দ্রব্যগুণ সংগ্রহে লিখিত গুণ অপেক্ষা শাস্ত্র ব্যবহার দৃষ্টে বহু অধিক গুণ, বহু মুষ্টিযোগ, ব্যবহার প্রণালী মাত্রা, সংযোগ বিয়োগের প্রণালী. প্রভৃতি বহু বিষয় লিখিত হইয়াছে।

যাঁহাদের বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞান আছে—এরূপ ব্যক্তিগণও কেবলমাত্র এই গ্রন্থের সাহায্যে দেশীয় ভৈষজ্য দ্বারা চিকিৎসা কার্য্যে বহু অদ্ভুত কৌশল দেখাইতে পারিবেন। ইহা ভিন্ন অনায়াসে অভ্রান্ত রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগ নির্ণয় নামক আর একখানি গ্রন্থও লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থেরও প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের—অভিনবত্ব. ভূতপূর্ব্বত্ব ও মহোপকারিতা সম্বন্ধে (হস্ত লিখিত অবস্থায় দেখিয়া) মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন গুপ্ত ও ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন গুপ্ত প্রভৃতি মহামান্য চিকিৎসকগণ ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

এখন আমার বিশেষ বক্তব্য এই যে,রাস্না, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বেড়েলা, প্রভৃতি অনেকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের স্বরূপ নির্ণয় সম্বন্ধে ধন্বন্তরীয় নির্ঘণ্টুকার ও রাজ নির্ঘণ্টুকার প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ নানা মত করিয়া রাখিয়াছেন, শাস্ত্রে এইরূপ নানা মত থাকা সঙ্গত নহে, কারণ ইহাতে চিকিৎসা কার্য্যে যে বিষম অসুবিধা ঘটে তাহা

চিকিৎসক মাত্রেই অবগত আছেন, এ জন্ত আমি বহুচিন্তা, চেষ্টা ও পরীক্ষা দ্বারা এক একটী দ্রব্যের স্বরূপ নির্ণয় সম্বন্ধে যাহা স্থির করিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছি, তাহা সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ চিকিৎসক মহোদয় গণের অবগতির জন্ত এই পত্রিকার প্রকাশিত করিলাম। যদি কেহ এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। এই কার্য্যে চিকিৎসক মাত্রেরই যত্নপর হওয়া কর্ত্তব্য।

আলোচ্য বিষয়।

বিদারী ও ক্ষীর বিদারী, শাস্ত্রে ঔষধার্থ বিদারী (ভূমিকুষ্মাণ্ড) শব্দের প্রয়োগই বেশী দেখা যায়। বিদারী জাতীয় দুই প্রকার কন্দ আছে, এক প্রকার প্রায় কুষ্মাণ্ডাকৃতি, অপর প্রকার প্রায় মূলকাকৃতি। কোন কোন নির্ঘণ্টকার ক্ষীরবিদারীকে আকারে বৃহৎ, শ্বেতবর্ণ, গুরু, ক্ষীর বিশিষ্ট ও অতিমধুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কুষ্মাণ্ডাকৃতি কন্দেই প্রায় এই সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়, কিন্তু অতি মধুরতা ঐ দুই প্রকার কন্দের মধ্যে কোনটীতেই নাই। বর্ত্তমানের শাকআলু জাতীয় কন্দই অতি মধুর এবং উহা আকারেও বৃহৎ দেখিতে পাওয়া যায়। হয়তো ঐ জাতীয় কন্দেই ক্ষীরবিদারী বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে।

বনৌষধি দর্পণকার লিখিয়াছেন যে; বরিশাল চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে মূলকাকৃতি কন্দকেই ভূমিকুষ্মাণ্ড বলিয়া ব্যবহার করা হয়, এ কথা সত্য হইলে উহা অত্যন্ত বিগর্হিত বলিতে হইবে, কারণ ভূমিকুষ্মাণ্ড স্থলে কুষ্মাণ্ডাকৃতি কন্দ পরিত্যাগ করিয়া মূলকাকৃতি কন্দ লওয়া হয় কেন? ইহার যুক্তি কি?

যাহা হউক আমি গুণের পরীক্ষায় যাহা বুঝিলাম ও সহজ জ্ঞানে যাহা আসে—তাহাই লিখিলাম, কুষ্মাণ্ডাকৃতি বৃহৎ কন্দই বিদারী (ভূমিকুষ্মাণ্ড) আর মূলকাকৃতি কন্দই ক্ষীরবিদারী।

তাহার পরে রাজনির্ঘণ্টকার লিখিয়াছেন,—ক্ষীর বিদারী দ্বিবিধ, বিনাল ও সনাল। এই বিনাল ও সনালের কোন লক্ষণ তিনি লেখেন নাই, সুতরাং ইহা লইয়াও বহু মতামত ঘটিয়াছে, কিন্তু স্থির নিশ্চয়ই কিছুই হয় নাই। বনৌষধি দর্পণকার লিখিয়াছেন যে, ইহা নিরূপণে আমি অজ্ঞ। আমি এ সম্বন্ধে বহুদেখিয়া শুনিয়া ও পরীক্ষা করিয়া যাহা স্থির করিলাম তাহা এই—মূলকাকৃতি কন্দের মধ্যে এক জাতির কন্দ একটু বড়, কিন্তু উহার নাল (লতা) ২॥ হাত বা ৩ হাতের ঊর্দ্ধ হয় না। উহার কন্দে সামান্ত কটু- (ঝাল) রস অনুভব হয়। অন্য প্রকারের নাল (লতা) অত্যন্ত বিস্তৃত হয়,—এইমাত্র পার্থক্য।

ক্রমশঃ

আয়ুর্ব্বেদ।

(শ্রীভোলাপদ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ)

(১)

"আয়ুর্ব্বেদ" আজি চিত্তে আমার—
জাগা'ল আবার দারুণ-ব্যথা।
অশীতি বর্ষ গত তবু ওগো—
ভুলিনি একটী ভুলের কথা।

(২)

নবীন যৌবন ছিলগো যখন—
উদিত জীবন-গগনে মোর।
চিত অনুরত আছিল সতত,
প্রতীচ্য বিজ্ঞান দর্শনে ভোর॥

(৩)

পুরাণ কাহিনী সাংখ্য যোগ-কথা :—
হাসিয়া দিতাম উড়ায়ে যত,
কভু মনে মনে পাইতাম ব্যথা,
স্বদেশ দৈন্য স্মরিয়ে কত।

(৪)

এমন সময় একটী ঘটনা, —
সকল গর্ব্ব করিয়া চূর্ণ,
দে'খাল কা'দের জ্ঞান ভাণ্ডার—
নিখিল রতন রাজিতে পূর্ণ।

(৫)

পূত চরিত জনক আমার,
একদা আমায় আদরে ডাযি'—
বলিলা, মধুর বচনে "সুরেন্,
নিয়ে চল মোরে এখন কাশী।

(৬)

আয়ুর্ব্বেদ ঋষি শ্রীগঙ্গাধর,
নিরখি' আমার শরীর চিহ্ন।
বলেছেন, বাছা! পঞ্চদশ দিনে
হইবে আমার জীবন ছিন্ন॥

(৭)

চিরদিন আমি পূজিব শঙ্কর
তাঁ'রি পদে মোর অচলা ভক্তি।
নিয়ে চল, বাপ্! বারাণসী ধামে
প্রসাদে তাঁহার পাইবে মুক্তি॥

(৮)

শুনিয়া পিতার করুণ-বচন ;
হৃদয়ে হইল বিষম ক্রোধ।
বলিলাম শুধু "কে, সে গঙ্গাধর—
সমুচিত তা'রে দিব প্রতিশোধ।

(৯)

কবিরাজী ক'রে বেচে ঘৃত তেল—
সম্বল শুধু 'চ্যবনপ্রাশ'।
সুস্থ শরীরে অমঙ্গল কথা
শোনাতে তাহার নাহিক ত্রাস॥"

(১০)

পিতা কহিলেন, "মানব সমাজে—
গ্রহণ করিলা মানবমূর্ত্তি,
গঙ্গাধর সেই দেব ধন্বন্তরি—
মিথ্যা কভু নহে তাঁহার উক্তি।"

(১১)

দেখি পিতার অন্ধ বিশ্বাস,—
দূর করিবারে মনের ভ্রান্তি।
অবশেষে গিয়া লইয়া আসিনু
ডাক্তার শ্রেষ্ঠ গৌরকান্তি।

(১২)

হেরিয়া পিতার সুকঠিন বপু—
ডাক্তারবর প্রকাশি হর্ষ।
বলিলেন—"কিছু নাহি আছে ভয়,
বাঁচিবে এখনো পনেরো বর্ষ।

(১৩)

ক্রমে ক্রমে দিন গত চতুর্দ্দশ,—
সময় নহে তো কাহারো দাস।
শুধু বিভু বই, তাঁহারি আদেশ
যথাকালে সবে করে প্রকাশ॥

(১৪)

পঞ্চদশ দিনে হেরিনু প্রভাতে—
পিতৃ বদনে অপূর্ব্ব কান্তি,
হরষে আমার চিত পুলকিত
পাইনু একটা গভীর শান্তি।

(১৫)

সে সুখ শান্তি সহসা ডুবিল :—
　　শোকসিন্ধু এ জীবনে ঘোর,
পিতার কাতর আহ্বান ধ্বনি
　　পশিল যখন শ্রবণে মোর ॥

(১৬)

দিবসের শেষে ধাইনু ত্বরায়
　　তাঁহার চরণ প্রান্ত পাশে,
হেরিনু— নিষ্প্রভ বদন, তপন
　　যেন গো হ'য়েছে, দিবস শেষে ॥

(১৭)

বলিলেন তিনি—"দেখ্ রে সুরেন্!
　　শিব জর মোরে করিল স্পর্শ।
গঙ্গাধর বাণী নহেরে মিথ্যা
　　(তাই) মরণেও মম হতেছে হর্ষ ॥

(১৮)

বিদেশীয় জ্ঞান করিলি অর্জ্জন
　　তার ফলে শুধু দেখাস্ যুক্তি,
শুধু বাছা, তোর মায়ায় আমার
　　এ জনম গেল,—হ'লনা মুক্তি ॥"

(১৯)

জীবন প্রারম্ভের সে মহৎ ভ্রান্তি—
　　পারিনি এখনো ভুলিতে হায়।,
যেই ভ্রম মম পিতৃ কামনা
　　দিলনা পূরণ করিতে তায়।

(২০)

আয়ুর্ব্বেদ ঋষি গঙ্গাধর বাণী—
　　সুজীব হৃদয়ে করিল উপ্ত।
আয়ুর্ব্বেদে তাই প্রগাঢ় ভক্তি—
　　ভ্রম জ্ঞান আজ হয়েছে লুপ্ত ॥

দম্পতী জীবন।

প্রসূতি চর্য্যা।

(পূর্ব্ব বৎসরের বৃত্তি)

[কবিরাজ শ্রীদ্বারকা নাথ সেন কাব্য-ব্যাকরণ তর্কতীর্থ]

প্রসবের পর গরম জল দ্বারা প্রসূতির ক্লেদাদি পরিষ্কার করিয়া দিয়া মৃদু মৃদু বায়ু সঞ্চালন, গাত্রে হাত বুলান প্রভৃতির দ্বারা তাহার প্রসব ক্লেশ নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, এবং সুস্থ হইলে প্রসূতির সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখাইয়া মন্দ মন্দ অগ্নিস্বেদ দিবে। সূতিকা গৃহের অন্ন পানীয় পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ হওয়া উচিত।

তাহার পর প্রসূতিকে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্যের মিলিত চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত সহযোগে পান করাইয়া তাহার উদরে ঘৃত ও তৈল

একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে, এবং একখানি বড় কাপড় দ্বারা উহার উদর চাপিয়া বাঁধিয়া দিবে। এইরূপ করিলে প্রসব ক্লেশ জন্ত দূষিত বায়ু উদরে অবসর না পাওয়ায় কোন রূপ বিকার জন্মাইতে পারে না। সূতিকা গৃহের অন্ন পানীয় পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত হওয়া উচিত। প্রসূতি ক্ষুধিত হইলে প্রথমে তাহাকে যথাযোগ্য মাত্রায় ঘৃত পান করাইতে হয়। ঘৃত জীর্ণ হইলে উপরি লিখিত পিপুল প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত যবাগূ পাক করিয়া তাহাতে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া উহা খাইতে দিবে। অন্ততঃ পাঁচ দিন এই ভাবে উক্ত চূর্ণ ও যবাগূ পান করাইয়া পরে ক্রমশঃ পুষ্টিকর দ্রব্য সমূহ ভক্ষণ করিতে দেওয়া উচিত। যাহাদের ঘৃত পরিপাক করিবার ক্ষমতা না থাকে, তাহাদিগকে উক্ত ক্রমে কেবল যবাগূ খাইতে দিতে হয়।

সম্প্রতি আমাদের দেশে প্রসূতিকে আর যবাগূ খাইতে দেওয়ার রীতি প্রায় দেখা যায় না, যে দিন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সে দিন কোন দ্রব্য খাইতে দেওয়া হয় না, তাহার পর দিন দশমূল পাঁচন ও ঘৃত সহ উল্লিখিত দ্রব্যগুলির চূর্ণ অথবা শুঁঠ, পিপুল ও গোলমরিচের চূর্ণ খাইতে দিয়া থাকে। ক্ষুধার সময় ঘৃত যুক্ত চিঁড়াভাজা এবং কিছু দুগ্ধ খাইতে দেওয়া হয়। তিন দিন এই নিয়মে রাখিয়া চতুর্থ দিবসে পুরাণ মিহি চাউলের অন্ন, কিঞ্চিৎ ঘৃত, অল্প লবণ ও বেশী গোলমরিচের ঝাল যোগে, কলা, পটোল, বেগুন, মাগুর বা কই মৎস্য প্রভৃতির দ্বারা সম্পন্ন রসযুক্ত ঝোল, খাইতে দেয়। এইরূপে খাদ্য বিষয়ে কিছুদিন সাবধানতা অবলম্বন করিয়া পরে অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া যায়। প্রসব হওয়ার পর অন্ততঃ দেড়মাস পর্য্যন্ত প্রসূতি অতি লঘু পথ্য ভোজন, প্রত্যহ তৈল মাখিয়া স্বেদ গ্রহণ, হলুদ তৈল মর্দ্দন করিবেন। পরিশ্রমের কাজ বা বিহারাদি পরিত্যাগ করিবেন। আমাদের দেশে প্রসূতিরা কেহ নয়দিন, কেহ এগার দিন, কেহ তেরদিন, কেহবা একুশদিন আতুঁড় ঘর হইতে বাহির হইয়া ক্ষৌরকর্ম্ম ও স্নানাদি বিশুদ্ধি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অন্তগৃহে প্রবেশ করেন।

শিশুচর্য্যা।

ভূমিষ্ট হওয়ার পর শিশু সম্বন্ধে যে নিয়ম অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা নবকুমারের নিয়ম নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। সম্প্রতি তাহার খাদ্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

চরক পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, প্রথম দিন যেমন ঘৃত ও মধু যোগে স্বর্ণ ভস্ম বা অসম পরিমাণে ঘৃত ও মধু, শিশুকে পান করান হয়, তেমনি নারীদুগ্ধও পান করিতে দিতে পারা যায়। কিন্তু প্রসবের পর অনেক সময়ে তিন চারি দিন প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ বাহির হয় না, সেই কারণে হউক অথবা উপযুক্ত স্বজাতীয় ধাত্রীর অভাবেই হউক এখন অনেক স্থানে তিন দিন শিশুকে নারী দুগ্ধ খাইতে দেওয়া হয় না। এই তিন দিন পাতলা নেকড়ার পলিতা করিয়া তাহার দ্বারা গোরুর দুধ পান করান হয়। চতুর্থ দিন মাতৃ স্তন্যও পান করিতে দেওয়া হয়, কিন্তু যদি স্বজাতিয়া স্নেহশীলা কোন ও স্ত্রীলোকের স্তন্য শিশুকে পান করাইবার সুযোগ থাকে, তাহা হইলে জন্মের পর প্রথম তিন দিন ও

নারীদুগ্ধ পান করিতে দেওয়াই ভাল বলিয়া বোধ হয়। যেহেতু গর্ভে স্থিতিকালে যে সকল রসাদির দ্বারা শিশু বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয় স্তনের দুগ্ধও তজ্জাতীয় রস, উহা পূর্ব্ব হইতে সাত্ম্য বলিয়া প্রসবের পর খাওয়াইলে ও হঠাৎ নূতন বস্তু খাওয়ার জন্য শিশুর কোন রূপ রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। নারী দুগ্ধের জন্যই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ধাত্রীর বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া উল্লেখ আছে। আমাদের দেশে সম্প্রতি সর্ব্বগুণ সম্পন্না স্বজাতীয়া ধাত্রী মিলেনা এবং তিন চারিদিন মাতার দুগ্ধের অভাব হয় বলিয়া অগত্যা গোদুগ্ধ পান করাইবার রীতি চলিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। স্তন দুগ্ধের অভাবে গোদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ ব্যবহার করান উচিত। ছাগ দুগ্ধ অথবা গোদুগ্ধে নারীদুগ্ধের অনেক সমান গুণ আছে। তবে ঐ সকল দুগ্ধ যেন ঘন না হয়। ইহা ভিন্ন অন্যান্য যত প্রকার কৃত্রিম দুগ্ধ আছে, তাহা শিশুশরীরের বিশেষ অনুপযোগী ও অস্বাস্থ্যকর।

কৃত্রিম দুগ্ধের যদি বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ অথবা ছাগদুগ্ধই প্রধান উপাদান হয়, তাহা হইলেও অপরাপর দ্রব্যের সংযোগ থ৷কাতে, তাহাতে যে গুণান্তর আসে না, তাহার কারণ কি? আহার্য্য দ্রব্যের সহিত প্রথম হইতে অনুপ-যোগী দ্রব্য খাওয়াইলে শরীরের স্বাস্থহানি অনিবার্য্য।

স্তনের দুগ্ধ খাওয়াইবার সময় প্রথমে স্তনটী পরিষ্কার করিয়া লইয়া এবং কিছু দুগ্ধ গালিয়া বালককে খাইতে দিতে হয়। গালিয়া না ফেলিলে হঠাৎ বেশী পরিমাণে দুগ্ধ মুখে যাইয়া গলনলী বন্ধ করিয়া দিতে পারে এবং সহসা বেশী দুগ্ধ পান করিয়া কাস শ্বাস রোগ জন্মিতে পারে।

দুগ্ধ পান করাইবার একটী সময় নির্দ্ধারণ করা উচিত। ঠিক সময়ে আহার না করাইলে বিষমাশন জন্য অনেক ব্যারাম জন্মিয়া থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধারও বৃদ্ধি হয়। এই জন্য কেবল স্তনের দুগ্ধে উদর পূরণ হয় না। সে সময়ে ক্রমে গরু ছাগলের দুধ নিয়মিত সময়ে খাওয়াইতে হয়। অন্ততঃ ছয়মাস পর্য্যন্ত শিশুকে দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন রূপ দ্রব্য সাগু, বা বার্লি প্রভৃতি খাওয়ান উচিত নহে। ক্ষুধিতা, শোকার্ত্তা, অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া, গর্ভ ও জ্বরের অবস্থায় শিশুকে মাতৃস্তন্য পান করাইতে নাই।' শিশু খাইতে না চাহিলে তাহাকে কোন ক্রমেই খাওয়ান কর্ত্তব্য নহে।

শিশুকে হরিদ্রা তৈল মাখাইয়া সহমত রৌদ্রপক্ক জলে স্নান করাইবে, এবং প্রত্যহ চক্ষুতে কাজল দিতে হয়, কাজলে চক্ষুর জল শুকাইয়া নির্ম্মলতা আনয়ন করে। শিশুকে আলোকযুক্ত চারিধারে বাতাস শূন্য, অথচ একদিকে বাতাসযুক্ত গৃহে ঋতুর অনুরূপ মনোরম কোমল শয্যায় শয়ন করাইবে। শয্যা সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকা আবশ্যক। শিশুর ব্যবহৃত কাপড়ের জিনিসগুলি ময়লা অথবা মলমূত্রাদি সংযুক্ত হইলে তাহা উত্তমরূপে সাবান বা ক্ষারাদির দ্বারা ধুইয়া তাহাতে যব, সরিষা, তিসি, হিং, গুগ্‌গুল, বচ, হরীতকী, জটামাংসী, চোরকাঁটা, প্রভৃতির চূর্ণ এবং ঘৃত মিশাইয়া তাহার ধুম দিয়া লইতে হয়, ও সুগন্ধি বাষ্প দিয়া সৌরভ যুক্ত করিতে হয়।

বালকের শরীর দৃঢ় না হইতেই অনেকে আদর করিয়া উহাকে বসাইতে ও দাঁড় করাইতে চেষ্টা করেন, এরূপ আদরে যে বালকের অঙ্গ চিরদিনের মত বিকৃত হইতে পারে, ইহা অনেকেই অবগত নহেন। বসিবার উপযুক্ত শরীরের দৃঢ়তা না আসিলে শিশুকে বসাইলে যে কুব্জ ও বধির হইতে পারে, ইহা সকলেরই মনে রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

কুমারের খেলনা সকল বিচিত্র শব্দযুক্ত, দেখিতে মনোহর। পাতলা অতীক্ষাগ্র এবং মুখের মধ্যে প্রবেশ বা ভয় উৎপাদন করিতে না পারে, এরূপ হওয়া উচিত।

শিশু কোনরূপ উৎপাত করিলে বা আহার করিতে না চাহিলে ভূত প্রেতের ভয় দেখাইয়া নিজের বশে আনিবার চেষ্টা করা আমাদের দেশে সচরাচর একটা নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে যে শিশুর মানসিক অবস্থার কত অবনতি ঘটিতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা যায় না। মানুষের মনে সাহস থাকা নিতান্ত উচিত। প্রথম হইতে অযথা ভাবে যদি শিশুর মনে ভয় সঞ্চার করা হয়,তাহা হইলে উহার মন দৃঢ় ও সাহসপূর্ণ না হইয়া ভীরু হইবেই। বাল্যকালের এই কুসংস্কার বশতঃ সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও অকারণ ভয় ত্যাগ করিতে না পারায় চিরকালের জন্য সাহসশূন্য হইয়া পড়ে।

ক্রমশঃ।

নিদানপরিশিষ্টং।

(স্বর্গীয় কবিরাজ হারাধন বিদ্যারত্ন)

—:*:—

জ্বরঃ।

দেহেন্দ্রিয়মনস্তাপী সর্ব্বরোগাগ্রজো বলী।
জ্বরঃ প্রধানং রোগাণামুক্তো ভগবতা পুরা॥
ঋতে দেবমনুষ্যেভ্যো নান্যো বিষহতে তু তং।
শেষাঃ সর্ব্বে বিপদ্যন্তে তৈর্য্যকযোন্য্ জ্বরার্দ্দিতাঃ॥
জন্মাদৌ নিধনে চৈব প্রায়ো বিশতি দেহিনঃ।
অতস্তমাদৌ বক্ষ্যামি স রোগানীকরাট্ স্মৃতঃ॥
তৈ*র্ব্বেগবদ্ভির্বহুধা সমুদ্ভূতৈর্বিমার্গগৈঃ।

দোষৈঃ।

বিক্ষিপ্যানাগোহন্তরাগ্নির্ভবত্যাশু বহিশ্চরঃ ॥
রুণদ্ধি চাপ্যপাং ধাতুং যস্মাত্তস্মাজ্জরাতুরঃ।
ভবত্যত্যুষ্ণগাত্রশ্চ নচ স্বিদ্যতি সর্ব্বশঃ ॥
দৌর্ব্বল্যমবিপাকশ্চ প্রলাপশ্চ ভ্রমঃ ক্লমঃ।
শীলবৈকৃতমঙ্গানাং শরীরস্যাবসন্নতা ॥
প্রদ্বেষো মধুরেভ্যশ্চ স্বধর্ম্মেষু ন চিন্তনং।
গুরুবাক্যেহভ্যসূয়া চ বালেষু দ্বেষ এবচ ॥
পরিক্লেশনমত্যর্থং ভোজ্যে মাল্যেঽনুলেপনে।
কট্বম্ললবণোষ্ণেষু প্রিয়ত্বং দীর্ঘসূত্রতা ॥
যুক্তস্য কর্ম্মণো হানিস্তথা কার্য্যে প্রতীপতা।
নিদ্রাধিক্যমনিদ্রা চ বিনামো দন্তহর্ষণং ॥
ভবন্ত্যেতানি লিঙ্গানি নরাণাং ভাবিনি জ্বরে ॥
ভবন্তি বিবিধা বাতবেদনাঃ পাদ সুপ্ততা।
পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনং কর্ণস্বনো বক্ত্রকষায়তা।
উরুসাদো হনুস্তম্ভো বিশ্লেষঃ সন্ধিজানুনোঃ।
শুষ্ককাসবমী লোমদন্তহর্ষঃ শ্রমভ্রমৌ।
অরুণং মূত্রনেত্রাদি তৃট্‌ প্রলাপোষ্ণকামিতাঃ।
নৃণামেতানি লিঙ্গানি জানীয়াদ্বাতিকে জ্বরে ॥
তীব্রোষ্মা রক্তকোঠাশ্চ শীতেচ্ছারুচিরেব চ।
পিত্তোদ্ভবে জ্বরে লিঙ্গং প্রাহুরেতন্মনীষিণঃ ॥
অত্যর্থং পিড়কা দেহে প্রসেকঃ শ্লেষ্মণো বমিঃ
শ্বসনং মৃদুতা বহ্নের্খাণ্যক্ষিষু শুক্লতা।
উষ্ণাভিলাষিতা চোপলেপো হৃদি কফজ্বরে ॥
অতিপ্রবৃত্তির্বাক্যানাং বাতপিত্তজ্বরে ভবেৎ ॥
কফপিত্তপ্রবৃত্তিশ্চ স্বেদস্তম্ভো মুহুর্মুহুঃ।
পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে চিহ্নান্যেতান্যপি ভবন্তি হি ॥
তদ্বচ্ছীতং মহানিদ্রা দিবা জাগরণং নিশি।
সদা বা নৈব বা নিদ্রা মহান্ স্বেদোঽথবা ন বা।
গীতনর্ত্তনহাস্যাদি বিকৃতেহাপ্রবর্ত্তনং।
লিঙ্গান্যেতানি মুনয়ঃ সন্নিপাতজ্বরে বিদুঃ ॥
দ্ব্যল্বণৈকোল্বণৈঃ ষট্‌ স্যুর্হীনমধ্যাধিকৈশ্চ ষট্‌।
সমশ্চৈকো বিকারাস্তু সন্নিপাতাস্ত্রয়োদশ ॥

ভ্রমঃ পিপাসা দাহশ্চ গৌরবং শিরসো ব্যথা।
বাতপিত্তোল্বণে বিদ্যাল্লিঙ্গং মন্দকফে জ্বরে ॥
শৈত্যং কাসোঽরুচিস্তন্দ্রা পিপাসা দাহরুগ্ব্যথাঃ।
বাতশ্লেষ্মোল্বণে বিদ্যাল্লিঙ্গং পিত্তাবরে ভিষক্ ॥
ছর্দ্দিঃ শৈত্যং মুহুর্দাহস্তৃষ্ণা মোহোঽস্থিবেদনা।
মন্দবাতে ব্যবস্যন্তি লিঙ্গং পিত্তকফোল্বণে ॥
সন্ধ্যস্থিশিরসঃ শূলং প্রলেপো গৌরবং ভ্রমঃ।
বাতোল্বণে স্যাদ্দ্ব্যনুগে তৃষ্ণা কণ্ঠাস্যশুষ্কতা ॥
রক্তবিণ্মূত্রতাদাহঃ স্বেদস্তৃট্ বলসংক্ষয়ঃ।
মূর্চ্ছা চেতি ত্রিদোষে স্যাল্লিঙ্গং পিত্তে গরীয়সি ॥
আলস্যারুচিহৃল্লাসদাহবম্যরতিভ্রমৈঃ।
কফোল্বণং সন্নিপাতং তন্দ্রা কাসেন চাদিশেৎ ॥
প্রতিশ্যাচ্ছর্দ্দিরালস্যং তন্দ্রারুচ্যগ্নিমার্দ্দবং।
হীনবাতে পিত্তমধ্যে লিঙ্গং শ্লেষ্মাধিক্যে মতং ॥
হারিদ্রমূত্রনেত্রত্বং দাহস্তৃষ্ণা ভ্রমোঽরুচিঃ।
হীনবাতে মধ্যকফে লিঙ্গং পিত্তাধিকে মতং ॥
শিরোরুক্ বেপথুঃ শ্বাসঃ প্রলাপশ্ছর্দ্দ্যরোচকৌ।
হীনপিত্তে মধ্যকফে লিঙ্গং বাতাধিকে মতং ॥
শীতকো গৌরবংতন্দ্রা প্রলাপোঽস্থিশিরোঽতিরুক্।
হীনপিত্তে বাতমধ্যে লিঙ্গং শ্লেষ্মাধিকে মতং ॥
বাতবর্চ্চোঽগ্নিদৌর্ব্বল্যং তৃষ্ণা দাহোঽরুচির্ভ্রমঃ।
কফহীনে বাতমধ্যে লিঙ্গং পিত্তাধিকে মতং ॥
শ্বাসঃ কাসঃ প্রতিশ্যায়ো মুখশোষোঽতিপার্শ্বরুক্।
কফহীনে পিত্তমধ্যে লিঙ্গং বাতাধিকে মতং ॥

এতদ্ভালুকিতন্ত্রাদাবন্যথা পঠিতং যথা ॥

বাতপিত্তাধিকো যস্য সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি।
তস্য জ্বরেঽঙ্গমর্দ্দস্তৃট্ তালুশোষপ্রমীলকাঃ।
তাধ্মানতন্দ্রারুচয়ঃ শ্বাসকাস ভ্রমশ্রমাঃ ॥
পিত্তশ্লেষ্মাধিকো যস্য সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি।
অন্তর্দাহো বহিঃ শীতং তস্য তন্দ্রা চ বর্ত্ততে।
তুদ্যতে দক্ষিণংপার্শ্বমুরঃশীর্ষগলগ্রহাঃ।
নিষ্ঠীবেৎ কফপিত্তঞ্চ তৃষ্ণা কণ্ঠশ্চদূয়তে।
বিড়্ভেদশ্বাসহিক্কাশ্চ বাধন্তে সপ্রমীলকাঃ।

বন্ধুকন্ধূ চ তৌ নাম্না সন্নিপাতাবুদাহৃতৌ ॥
শ্লেষ্মানিলাধিকো যস্য সন্নিপাতঃ প্রকুপ্যতি ।
তস্য শীতজ্বরো নিদ্রা ক্ষুত্তৃষ্ণা পার্শ্বসংগ্রহঃ ।
শিরোগৌরবমালস্যমন্যাস্তম্ভপ্রমীলকাঃ ।
উদরং দহ্যতে চাস্য কটী বস্তিশ্চ দূয়তে ।
সন্নিপাতঃ স বিজ্ঞেয়ো মকরীতি সুদারুণঃ ।
বাতোল্বণঃ সন্নিপাতো যস্য জন্তোঃ প্রকুপ্যতি ।
তস্য তৃষ্ণাজ্বর গ্লানিপার্শ্বরুগদৃষ্টিসংক্ষয়াঃ ।
পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনং দাহ উরুসাদো বলক্ষয়ঃ ।
সরক্তশ্চাস্য বিন্মূত্রং শূলং নিদ্রাবিপর্য্যয়ঃ ।
নির্ভিদ্যতে গুদশ্চাস্য বস্তিশ্চ পরিশুষ্যতি ।
আযম্যতে ভিদ্যতে চ হিক্কতে বিলপত্যপি ।
মূর্চ্ছতি ক্ষায়তে রৌতি নাম্না বিস্ফুরকঃ স্মৃতঃ ॥
পিত্তোল্বণঃ সন্নিপাতো যস্য জন্তোঃ প্রকুপ্যতি ।
তস্য দাহজ্বরো ঘোরো বহিরন্তশ্চ বর্দ্ধতে ।
শীতঞ্চ সেবমানস্য কুপ্যতঃ কফমারুতৌ ।
ততশ্চৈনং প্রবাধন্তে হিক্কাশ্বাসপ্রমীলকাঃ ।
বিসূচিকা পর্ব্বভেদং প্রলাপো গৌরবং ক্লমঃ ।
নাভিপার্শ্বরুজা তস্য স্বিন্নস্যাশু প্রবর্দ্ধতে ।
স্বিদ্যমানস্য রক্তঞ্চ স্রোতোভ্যঃ সং প্রবর্ত্ততে ।
অসাধ্যঃ সন্নিপাতোঽয়ং শীঘ্রকারীতি কথ্যতে ।
নহি জীবত্যহোরাত্রমেতেনাবিষ্টবিগ্রহঃ ॥
কফোল্বণঃ সন্নিপাতো যস্য জন্তোঃ প্রকুপ্যতি ।
তস্য শীতজ্বরস্বপ্নগৌরবালস্যতন্দ্রয়ঃ
ছর্দ্দির্মূর্চ্ছা তৃষা দাহতৃপ্ত্যরোচকহৃদ্গ্রহাঃ ।
ষ্ঠীবনং মুখমাধুর্য্যং শ্রোত্ররাগ দৃষ্টিনিগ্রহঃ ।
শ্লেষ্মণো নিগ্রহঞ্চাস্য যদা প্রকুরুতে ভিষক্ ।
তদা তস্য ভৃশং পিত্তং কুর্য্যাৎ সোপদ্রবং জ্বরং ।
নিগৃহীতে চ পিত্তে তু ভৃশং বায়ুঃ প্রকুপ্যতি ।
নিরাহারস্য সোঽত্যর্থং মেদো মজ্জাস্থি ধাবতি ।
অথাত্র স্নাতি ভুঙ্‌ক্তে বা ত্রিরাত্রং ন স জীবতি ।
মেদোগতঃ সন্নিপাতঃ কাপফণঃ সমুদাহৃতঃ ।

কামান্মোহাচ্চ লোভাচ্চ ভয়াচ্চায়ং প্রপদ্যতে॥
হীনমধ্যাধিকৈর্দোষৈঃ সন্নিপাতো যদা ভবেৎ।
তস্য রোগাস্ত এবোক্তাঃ প্রায়ো দোষবলাশ্রয়াঃ॥
ওজো বিস্রংসতে যস্য পিত্তানিলসমুচ্ছ্রয়াৎ।
স গাত্রস্তম্ভশীতাভ্যাং শয়নে স্যাদচেতনঃ।
অপি জাগ্রৎ স্বপন্ জন্তুস্তন্দ্রালুশ্চ প্রলাপবান্।
সংহৃষ্টরোমা স্রস্তাঙ্গো মন্দসন্তাপবেদনঃ।
ওজো নিরোধজং তস্য জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্॥
সন্নিপাতজ্বরং কৃচ্ছ্রমসাধ্যমপরে বিদুঃ।
নিদ্রোপেতমভিন্যাসং ক্ষীণং বিদ্যাদ্ধতৌজসং।
সংস্তব্ধগাত্রং সংন্যাসং বিদ্যাৎ সর্ব্বাত্মকে জ্বরে॥
নাত্যুষ্ণশীতোঽল্পসংজ্ঞো ভ্রান্তপ্রেক্ষী হতপ্রভঃ।
সাশ্রুনির্ভুগ্নহৃদয়ো ভক্তদ্বেষী হতস্বরঃ।
খরজিহ্বঃ শুষ্ককণ্ঠঃ স্বেদবিণ্মূত্রবর্জ্জিতঃ।
শ্বসন্ নিপতিতঃ শেতে প্রলাপোপদ্রবৈর্বৃতঃ।
তমভিন্যাসমিত্যাহুর্হতৌজসমথাপরে॥
তত্রাভিঘাতজো বায়ুঃ প্রায়ো রক্তং প্রদূষয়ন্।
সব্যথাশোথবৈবর্ণ্যং জ্বরমাপাদয়েদ্ভৃশং॥
কামশোকভয়ক্রোধৈরভিষক্তস্য যো জ্বরঃ।
সোঽভিষঙ্গো জ্বরো জ্ঞেয়ো যশ্চ ভূতাভিষঙ্গজঃ॥
বিষবৃক্ষানিলস্পর্শাত্তথাঽন্যৈর্বিষসম্ভবৈঃ।
অভিষক্তস্য চাপ্যাহুর্জ্বরমেকেঽভিষঙ্গজং॥
তত্রাভিচারিকৈর্ম্মন্ত্রৈর্হূয়মানস্য তপ্যতে।
পূর্ব্বং চেতস্ততো দেহস্ততো বিস্ফোটতৃড্ভ্রমৈঃ।
সদাহমূর্চ্ছাগ্রস্তস্য প্রত্যহং বর্দ্ধতে জ্বরঃ॥
সর্ব্বাঙ্গদহনঞ্চৈব হ্রীনিদ্রাধীধৃতিক্ষয়ঃ।
ধ্যানং নিশ্বাসবহুলং লিঙ্গং কামজ্বরে স্মৃতং।
শোকজে বাষ্পবহুলং ত্রাসপ্রায়ং ভয়জ্বরে॥
ক্রোধজে বহুসংরম্ভং ভূতাবেশে ত্বমানুষং॥
বিষান্মোহমদগ্লানিভূয়িষ্ঠং ভবতি জ্বরে॥
কেষাঞ্চিদেষাং লিঙ্গানাং সন্তাপো জায়তে পুরঃ।
পশ্চাতুল্যাস্তু কেষাঞ্চিদেষু কামজ্বরাদিষু॥

কামাদিজানামুদ্দিষ্টং জরাণাং যদ্বিশেষণং।
কামাদিজানামন্তেষ্যাং রোগাণামপি তৎ স্মৃতং॥
যঃ স্যাদনিয়তাৎ কালাৎ শীতোষ্ণাভ্যাং তথৈব চ।
বেগতশ্চাপি বিষমো জরঃ স বিষমঃ স্মৃতঃ॥
অহোরাত্রাদহোরাত্রাৎ স্থানাৎ স্থানং প্রসাতি স *।
ততশ্চামাশয়ং প্রাপ্য ঘোরং কুর্য্যাজ্জরং নৃণাং॥
কফস্থানবিভাগেন যথাসংখ্যং করোতি হি।
সততান্যেদ্যুকত্র্যাখ্যচতুর্থান্ সপ্রলেপকান্॥
স চাপি বিষমো দেহং ন কদাচিদ্বিমুঞ্চতি।
গ্লানিগৌরকার্শেভ্যঃ স যস্মান্ন প্রমুচ্যতে॥
বেগেঽতিসমতিক্রান্তে গতোঽয়মিতি লক্ষ্যতে।
ধাত্বন্তরস্থো লীনত্বান্নসৌক্ষ্ম্যান্নোপলভ্যতে॥
কফস্থানেষু বা তিষ্ঠন্ দোষো দ্বিত্রিচতুর্ষু বা।
বিপর্য্যয়াখ্যান্ কুরুতে বিষমান্ কৃচ্ছ সাধনান্॥
হীনমধ্যাধিকৈর্দোষৈস্ত্রিসপ্তদ্বাদশাহিকঃ।
জরবেগো ভবেত্তীব্রো যথাপূর্ব্বং সুখক্রিয়ঃ॥
যথা বেগাগমে বেলাং ছাদয়িত্বা মহোদধেঃ।
বেগহানৌ তদেবাম্ভস্তত্রৈবান্তর্নিধীয়তে।
দোষবেগোদয়ে তদ্বদ্দীর্য্যেত জরোঽস্য বা।
বেগহানৌ প্রশাম্যেত যথাম্ভঃ সাগরে তথা॥
শোথঃ সরক্তো নাসায়াং ব্যথা স্রাবো জরস্তথা।
বাশ্লেষ্মাসৃগুত্থানমাহকাখ্যং জরং বদেৎ॥

* দোষঃ।

—:*:—